রাজ্য কাউন্সিলের আহ্বান

বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি গড়ে তুলুন

মনোজ কান্তি গুহ

সংগঠনের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থা রাজ্য কাউন্সিলের চতুর্থ সভা গত ২১-২২ মার্চ, ২০১৫ কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। পরিস্থিতিগত বাধাবিঘ্নকে মোকাবিলা করে, সমস্ত ধরনের ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে কর্মচারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে বর্তমান পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুযায়ী লড়াই, আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ক্রমান্বয়ে ভিন্নমাত্রার কর্মসূচী গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এই কাউন্সিল সভা। সভার প্রারম্ভে সংগঠনের সহ-সভাপতিত্রয় চুনীলাল মুখার্জী, চন্দন ঘোষ এবং কৃষ্ণা বসুকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন চুনীলাল মুখার্জী।

প্রাথমিক প্রস্তাবনায় সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ বলেন, গত ১৩-১৪ মার্চ, ২০১৫ দুদিনব্যাপী কেন্দ্রীয় কমিটির পঞ্চম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০১৪ সারা রাজ্যে ৩৪১টি ব্লক সফরের তথ্যভিত্তিক সাংগঠনিক পর্যালোচনা সহ রিপোর্ট ও বিগত কর্মসূচীগুলি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির সভার প্রথমদিন ব্লক সফরের সরাসরি অভিজ্ঞতা আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে সংগঠনকে মজবুত করার লক্ষ্যে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা এবং বহুবিধ সুপারিশ যেভাবে উঠে এসেছে, তা এক কথায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, সারা পৃথিবীতেই শ্রমজীবী জনগণের ওপর ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে, আবার তার বিরুদ্ধে লড়াই-আন্দোলনও ব্যাপকতর হচ্ছে। সংকটগ্রস্ত পরিস্থিতিতে গোটা ইউরোপ সহ উন্নত দুনিয়া উত্তাল হচ্ছে। এই অবস্থায় আমাদের দেশে আসীন হয়েছে— দারুণ প্রতিক্রিয়াশীল একটি সরকার। উন্নত দেশগুলি যেখানে নয়া উদারনীতির পথ থেকে কিছুটা সরে এসে বর্তমানে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে, সেখানে আমাদের দেশের সরকার উল্টোপথে হাঁটছে। বীমা বিল তারা কংগ্রেসের সমর্থনে পাশ করিয়ে নিয়েছে। রাজ্যগুলিকে সংগৃহীত রাজস্বের ৪২ শতাংশ কেন্দ্র দিচ্ছে অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, অথচ প্রধানমন্ত্রী সংসদে লঘুভাবে বলছেন রাজ্যগুলিকে তাঁরা এত টাকা দিচ্ছেন যে তাদের সেই অর্থ রাখার মত সিন্দুক পর্যন্ত নেই— অর্থাৎ, যেন দয়ার দান। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছেন, তাঁরা ভাবছেন এই সরকার সদিচ্ছা থেকে রাজ্যগুলিকে বর্ধিত ১০ শতাংশ টাকা দিচ্ছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পগুলির অর্থবরাদ্দ ছাঁটাই করা হচ্ছে, রেগার বরাদ্দ ছাঁটাই করা হচ্ছে। শ্রমজীবী গরীব মানুষকে জীবনধারণের সুরক্ষা দেবার দায় কেন্দ্র ঝেড়ে ফেলতে চাইছে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি— হিংসার এই রাজনীতি ভয়াবহ বিপদ হিসাবে মানুষের সামনে হাজির হয়েছে। বহুত্ববাদী সংস্কৃতি থেকে হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতির দেশে রূপান্তরের চেষ্টা চলছে এখানে। এরাজ্যে আক্রমণ দারুণ বাড়ছে, কিন্তু এখনও মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ, স্থানীয় স্তরে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলার মতো বাস্তবতা তৈরি হচ্ছে না। লুম্পেনরা আগ্রাসীশক্তি নিয়ে দারুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এখন প্রতি মুহূর্তে আক্রান্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। আগে বামপন্থী কর্মী সমর্থকরা খুন হচ্ছিলেন, ধর্ষিতা হচ্ছিলেন। এখন সন্ন্যাসিনী ধর্ষিতা হচ্ছেন, সাধারণ মানুষ ধর্ষিতা হচ্ছেন, খুন হচ্ছেন। এই পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবার মতো পরিবেশ

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

অসিত কুমার ভট্টাচার্য

আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতিপালন

আলোচক রেখা গোস্বামী

'যখন সারা পৃথিবী মৌন, তখন একক কণ্ঠস্বরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে'— দুনিয়া জুড়ে মহিলাদের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মুখ হয়ে উঠেছে মালালা ইউসুফজাই। ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার উদ্ধৃতি এবং ছবি সংবলিত পোস্টারে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির এ বছরের ৮ মার্চ উদ্‌যাপনের কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছিল। 'উদারীকরণ শ্রম আইন সংস্কার এবং মৌলবাদের বিরুদ্ধে নারীদের সংগ্রাম' শীর্ষক আলোচনা সভা। কিন্তু সময়ের চাহিদা অনুযায়ী গত ১৭ মার্চ কর্মচারী ভবনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মসূচীটিতে সামান্য পরিবর্তন করতে হয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে। রানাঘাটে মিশনারী স্কুলে বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনীকে ধর্ষণ আর পার্ক স্ট্রীট ধর্ষণকাণ্ডে ধর্ষিতা সুজেট জর্ডনের অকাল মৃত্যুতে বেদনাবিক্ষুব্ধ মন যখন প্রতিবাদের পথ খুঁজছিল, তখনই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় মহিলা উপসমিতির উদ্যোগে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মহিলা কর্মচারীরা প্রতিবাদী মিছিলে পথ হাঁটলেন কর্মচারী ভবন থেকে

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

রানাঘাটে সন্ন্যাসিনী ধর্ষণের প্রতিবাদে মৌন মিছিল

মহার্ঘভাতা ও বেতন কমিশনের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পত্র

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ

ক্রমিক নং : কো-অর্ডি - ২৪/১৫
তারিখ : ১১-০৩-২০১৫

সম্মানীয়া মহোদয়া,

আপনাকে বিনম্রভাবে অবগতির উদ্দেশ্যে জানাই যে, ইতোমধ্যে কয়েকটি পত্র মারফত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও সরকারী কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সমগ্র অংশের শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনসহ বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদানের দাবী জানানো হয়েছে। কিন্তু বেদনার হলেও সত্য আজ অবধি উক্ত পত্রগুলির কোন প্রত্যুত্তর পাওয়া যায়নি। তীব্র মূল্যবৃদ্ধির আঘাতে রাজ্য সরকারী কর্মচারী সহ অন্যান্য অংশের শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীসমাজ আজ জর্জরিত। প্রতিনিয়ত কর্মচারীদের বেতন দারুণভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। বর্তমানে বেতনের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্মূল্যায়ন জরুরী হয়ে উঠেছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারীদের বেতনের গড় হার ক্রমশঃ নিম্নগামী, অথচ রাজ্য সরকারের এবিষয়ে কোন নীতিগত বক্তব্য নেই।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত হয়েছে যে কেন্দ্রীয় করের ৪২ শতাংশ রাজ্যগুলিকে দেওয়া হবে। আগে কেন্দ্রীয় করের মাত্র ৩২ শতাংশ দেওয়া হতো অর্থাৎ এখন ১০ শতাংশ বেশী কেন্দ্রীয় কর রাজ্য পাবে। এছাড়া রাজস্ব ঘাটতি দূর করতে প্রথম দুবছরে ১১,৭৬০ কোটি টাকা অনুদান, পঞ্চায়েত ও পৌরসভাকে উন্নয়নের জন্য ৫ বছরে মোট ২০,৮৩১ কোটি টাকা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য অনুদান বৃদ্ধি করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ কয়লা ও অন্যান্য রয়ালটি বাবদ বছরে অতিরিক্ত ১৬০০ কোটি টাকা এবং কোল-ব্লক বণ্টন থেকে আরও ১১,২০০ কোটি টাকা পাবে। আপনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাদয়কে বলেছেন রাজ্যের রাজস্ব খাতে আয় পূর্বে ২০০০০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে বর্তমানে ৪০০০০ কোটি টাকায় উন্নীত করেছেন। রাজ্যের মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশের সময় বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের জি. ডি. পি. গ্রোথ ভারতের গড় জি. ডি. পি. গ্রোথের চেয়ে বেশী। এত উন্নয়ন, এত নতুন নতুন ক্ষেত্রে অর্থ পাওনা, আপন্ন তহবিল ও গণহিসাব থেকে আদায় বাবদ অর্থ ইত্যাদি মিলে অর্থের পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা বঞ্চিত হবেন কেন?

রাজ্যের মাননীয় অর্থমন্ত্রীর পেশকৃত বাজেট বিবৃতি শেষে 'গাহি সাম্যের গান' গাওয়া হয়েছে তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে অসাম্য কেন? কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় ভারতের বৃহৎ ও মাঝারি রাজ্যগুলি ১০০% অথবা ১০৭% মহার্ঘভাতা পান, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা পান মাত্র ৬৫ শতাংশ। অর্থাৎ ৪২ শতাংশ মহার্ঘভাতা পাওনা থেকে বঞ্চিত কর্মচারীসমাজ। সারা বিশ্বজুড়ে যে বিশ্বায়নের পর্ব চলছে তার প্রধান বক্তব্য শ্রমিক, কর্মচারীর শ্রমের মজুরির ভাগ কমাও, বেতন সংকোচন করো। কম বেতনে চুক্তিতে শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োগ এবং হায়ার অ্যাণ্ড ফায়ার নীতি প্রয়োগ।

আমাদের রাজ্যে প্রশাসনে চুক্তিপ্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে স্থায়ী কর্মচারীদের মতো সুযোগ দেওয়ার দাবী আমরা বহুদিন ধরে জানাচ্ছি। নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রোবেশন পিরিয়ড এবং পূর্ণ বেতন না দেওয়ার আদেশ বাতিল করার দাবীও আমরা ইতোপূর্বে উত্থাপন করেছি।

উল্লিখিত পরিস্থিতির পটভূমিকায় সমগ্র বিষয়গুলি আপনার বিবেচনার জন্য রেখে এবং বকেয়া ৪২ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান এবং ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন করে শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চরম বঞ্চনার অবসান ঘটানোর অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়
(মনোজ কান্তি গুহ)
।। সাধারণ সম্পাদক।।

৪৪তম গ্রাহক বর্ষের আহ্বান

সকলের হাতে থাক সংগ্রামী হাতিয়ার

সরকারী দপ্তরগুলিতে আসন্ন ৪৪তম বর্ষের সংগ্রামী হাতিয়ারের গ্রাহক ভুক্তির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। সংগঠন নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই কাজ সমাপ্ত করতে হবে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যভুক্তির কাজটিও চলছে বছরের শুরুতে। ফলে গ্রাহকভুক্তির সাথে সাথে সংগ্রামী হাতিয়ার ও নিজস্ব সংগঠনের মুখপত্রের গ্রাহকভুক্তি ও পুনর্নবীকরণের কাজটিতেও সর্বস্তরের নেতা কর্মীগণ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে সাফল্য এনে থাকেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সর্বস্তরের নেতা কর্মীগণও এই কর্মসূচীকে সফল করার উদ্দেশ্যে আন্তরিক ভাবে ব্রতী হবেন — এই আশা রাখে পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলী।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্যটি অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিচার করা ঠিক হবে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সামান্য ছিঁটেফোঁটা লাভ করে কর্মচারী সমাজকে সন্তুষ্ট রাখার পরিবর্তে, পাঞ্জা কষে ন্যায্য দাবি আদায় করে নেওয়ার মানসিকতায় সংগঠন ও কর্মচারী সমাজকে গড়ে তুলে, খণ্ড ভাবনার ভ্রান্ত পথ থেকে সরিয়ে এনে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মঞ্চে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। সেই ভাবনাকে সযত্নে গোটা রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কাছে পৌঁছে দিতে ১৯৭১ সাল থেকে নিরলস ভাবে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে সংগঠনের মুখপাত্র সংগ্রামী হাতিয়ার। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয় প্রতিবেশী ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারী সমাজও অনুপ্রাণিত হয় এই পত্রিকার দ্বারা। সংগ্রামী মানসিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এই পত্রিকা ত্রিপুরার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদেরও অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

বিশেষত বর্তমান পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের বি জে পি সরকার দেশের আর্থিক সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীন বিদেশ নীতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশিত নীতিকে অতি দ্রুততার সাথে কার্যকর করতে উঠে পড়ে লেগেছে। ভারতবর্ষের প্রজাতন্ত্র দিবসে মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুরক্ষাকে সরাসরি জলাঞ্জলি দিয়েছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। এই পারমাণবিক চুক্তির বিরোধিতা করেই বামপন্থীরা ইউ পি এ-১ সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল, সেই সময়ে। আবার রাজ্যেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তৃণমূল দল দ্বারা পরিচালিত এক নৈরাজ্যের সরকার। সরকারটি পরিচালিত হচ্ছে এমন কিছু ব্যক্তিকে মদত দিয়ে যারা আইন মানে না। ফলে প্রতিনিয়ত মহিলাদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে)

সংগ্রামী হাতিয়ার
মার্চ ২০১৫
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
৪৩ তম বর্ষ □ একাদশ সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

রাজ্য সরকার চূড়ান্ত কর্মচারী বিদ্বেষী তাই শুধু ফোঁস করলে হবে না

গত বিধানসভা নির্বাচনের (২০১১) পর, প্রায় চার বছর ধরে ক্রমান্বয়ে যে যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের হতে হয়েছে, এক কথায় তাকে ব্যাখ্যা করতে হলে বলতে হয়, 'সুখকর নয়'। 'সুখকর নয়' এই দুটি শব্দবন্ধের পক্ষে-বিপক্ষে যদি কর্মচারী বন্ধুদের ভোট দিতে বলা হয়, তাহলে সম্ভবত একজন কর্মচারীও বিপক্ষে ভোট দেবেন না। অর্থাৎ চার বছরের অভিজ্ঞতা 'সুখকর' এমন কথা কেউই বলবেন না। না, তাঁরাও বলবেন না, যাঁরা এই পরিবর্তন চেয়েছিলেন বা পরিবর্তনের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। এমনকি, এখন যাঁরা শাসক রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকেই কর্মচারী সংগঠন পরিচালনা করছেন এবং ক্বচিৎ-কদাচিৎ নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেবার জন্য 'নবান্নে' ডেপুটেশন দেবার ভান করছেন, তাঁরাও সকলের সামনে না হলেও আড়ালে বলতে বাধ্য হচ্ছেন, এই পরিবর্তন রাজ্য সরকারী কর্মচারী সহ রাজ্য সরকারের বেতনভুক সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষকদের কাছে ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে উঠছে।

পরিস্থিতি ক্রমশ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এ কথাটা বলাই সঙ্গত। কারণ প্রতিটি ন্যায্য পাওনা শুধু বকেয়াই থাকছে না, চূড়ান্ত অবহেলিত হচ্ছে, উপেক্ষিত হচ্ছে। কর্মচারী স্বার্থবিরোধী সরকার বললেও এই সরকারের প্রকৃত চরিত্রকে আর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছে না। এই সরকার কর্মচারী বিদ্বেষী সরকার। আপাদমস্তক অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী। মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই শুধু নয়, মিথ্যা ভাষণেও এই সরকারের জুড়ি সারা দেশে পাওয়া যাবে না।

সকাল দেখলেই যেমন বোঝা যায় দিনটা কেমন যাবে, ঠিক তেমনই শুরু থেকেই বোঝা গেছিল এই সরকারের 'মা-মাটি-মানুষ'-এর স্লোগান লোক ঠকানো স্লোগান ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা যে শুধু কর্মচারীরা উপলব্ধি করেছিলেন তা নয়। সর্বস্তরের মানুষের উপলব্ধিতেই তা চলে এসেছিল কিছুদিনের মধ্যেই। যে যে কারণে মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে তা বহুল আলোচিত। এখানে শুধু নিজেদের প্রসঙ্গগুলির অবতারণা করা যেতে পারে।

প্রথমত, পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় অংশের সুপারিশ আজ পর্যন্ত দিনের আলো দেখল না কেন? প্রথম অংশের সুপারিশ দ্রুততার সাথে কার্যকরী করেছিল বিগত বামফ্রন্ট সরকার। কিন্তু দ্বিতীয় অংশকে কার্যকরী করার সুযোগ বামফ্রন্ট সরকার পায়নি। কারণ বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গেছিল। নির্বাচনে বামফ্রন্ট পরাজিত এবং বর্তমান শাসক দল জয়ী হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে পূর্বতন সরকারের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব পরবর্তী সরকারের ওপরেই বর্তায়। কারণ সরকার একটি চলমান প্রক্রিয়া। নির্বাচনে শাসকের পরিবর্তন ঘটতে পারে, কিন্তু শাসন ব্যবস্থায় ছেদ পড়ে না। বিগত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রীর পদে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা নিশ্চয় মহাকরণ ছেড়ে যাবার সময় ফাইল বগলদাবা করে নিয়ে চলে যান নি। তাহলে দ্বিতীয় অংশের সুপারিশ কার্যকরী করা হল না কেন? দ্বিতীয় অংশের সুপারিশ কার্যকরী করার জন্য, 'টাকা নেই', 'টাকা নেই' বলে মায়াকান্নার সুযোগও বেশি নেই। কারণ দ্বিতীয় অংশে সাধারণত যে ধরনের সুপারিশ থাকে, তাতে খুব বেশি অতিরিক্ত আর্থিক দায়ভার বহন করার কোনো অবকাশ থাকে না। বেতন কাঠামো এবং বেতন ও ভাতার সংশোধন ও সংযোজন যা হবার তা প্রথম অংশেই হয়ে যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও দ্বিতীয় অংশের সুপারিশগুলি, এমনকি আলোচনার টেবিলেও আনা হল না। কার্যকরী করা তো দূরের কথা। সরকারের এই অ্যাটিচিউড'কে বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছু বলা যায় কি?

শুধু পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় অংশের সুপারিশই নয়, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা, ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন প্রভৃতি প্রতিটি ন্যায্য দাবিই এখন অগাধ জলে। বছরে একবার মহার্ঘভাতা দেওয়া হয় সরকারের বা বলা ভালো মুখ্যমন্ত্রীর মর্জি মাফিক। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অর্জিত অধিকার। সুতরাং সেই অধিকারকে মর্যাদা দিয়ে যতটা সম্ভব কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে তাল মিলিয়ে চলার (মহার্ঘভাতা প্রদানে) একটা প্রচেষ্টা থাকবে। কোনো কারণে সম্ভব না হলে, স্বীকৃত সংগঠনগুলির সাথে আলোচনায় বসে, সরকার তার সমস্যার কথা বলবে, কর্মচারীদের সমস্যার কথা শুনবে। এটাই তো প্রশাসন পরিচালনার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। এভাবেই তো তিন দশকেরও বেশি সময় প্রশাসনকে দেখতে আমরা অভ্যস্ত। অথচ এখন মহার্ঘভাতা বছরে মাত্র একবার যখন ঘোষণা করা হচ্ছে, তখন মনে হচ্ছে যেন কর্মচারীদের প্রতি দয়া করা হচ্ছে বা ভিক্ষে দেওয়া হচ্ছে। ৪৯ শতাংশ বকেয়া, দেওয়া হল ৭ শতাংশ। কেন ৭ শতাংশ, কেন ১৩ শতাংশ বা ২০ শতাংশ নয়, কোথায় সমস্যা কোনো কিছুই আলোচনা করার সুযোগ নেই। চিঠি দিলেও তার জবাব দেওয়ার সৌজন্যটুকু পর্যন্ত সরকার দেখায় না। কি বলা হবে এই সরকারকে? কর্মচারী বিদ্বেষী নয়?

নতুন বেতন কমিশন সম্পর্কে অদ্ভুত যুক্তি। কেন্দ্র টাকা দিলে তবে বেতন কমিশন হবে। এমন শর্তসাপেক্ষ বেতন কমিশনের কথা আমরা গত ৩৪ বছরে তো কখনও শুনিনি। চার-চারটি বেতন কমিশন গঠিত হয়েছে, তাদের সুপারিশগুলি কার্যকরী হয়েছে, আমাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য বিভিন্ন সুযোগও আমরা পেয়েছি অথচ কেন্দ্র তো একটা টাকাও দেয়নি। তা বলে কি বেতন কমিশন কার্যকরী হয় নি? হ্যাঁ, কেন্দ্রের কাছে সহযোগিতা চাওয়া যেতেই পারে। অতীতেও চাওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র না দিলে আমরা করব না—এমন কথা কখনও কোনো রাজ্য সরকার বলেছে বলে শোনা যায় নি। আসলে এই অদ্ভুত যুক্তি অবতারণা করার কারণই হল রাজ্য সরকার বেতন কমিশন গঠন করতেই চায় না। রাজ্য সরকার জানে কেন্দ্র কখনই বেতন কমিশন খাতে কোনো টাকা রাজ্যকে দেবে না। তাহলে কি বেতন কমিশন হবে না? বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর বেতন-ভাতা পুনর্বিন্যাসের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি হল বেতন কমিশন গঠন ও তার সুপারিশ কার্যকরী করা।

যে সরকার এই স্বীকৃত পদ্ধতি অস্বীকার করে, তাদের কর্মচারী-বিদ্বেষী ছাড়া আর কিছু বলা যায় কী? একদিকে অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলছেন, সরকারের না কি আয় বেড়েছে। অথচ সেই বাজেটেই দেখা যাচ্ছে বেতন ভাতা খাতে গত আর্থিক বছরে সরকার যা বরাদ্দ করেছিল তারও সবটুকু খরচ করেনি। তাহলে এই সরকারকে কী বলা যাবে? বিপুল মহার্ঘভাতা বকেয়া, অথচ সরকার বরাদ্দের তুলনায় খরচ করেছে কম। এমন দ্বিতীয় কোনো উদাহরণ ভূ-ভারতে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এই রাজ্য সরকারের আচরণ আরও একটি প্রবচন মনে করিয়ে দেয়। তা হল 'ভাত দেওয়ার মুরোদ নেই, কিল মারার গোঁসাই'। পাওনা-গণ্ডা সব শিকেয় উঠেছে, অথচ আক্রমণে খামতি নেই। কথায়, কথায় শো-কজ, সাসপেনশন, বদলি। কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা নেই। যেন মাৎস্যন্যায় চলছে সমগ্র রাজ্য প্রশাসন জুড়ে। জেলায় জেলায় ব্লক স্তরের দপ্তরগুলিতে তো পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক। সেখানে শাসক দলের স্থানীয় পাণ্ডারা সরাসরি সরকারী অফিসে ঢুকে হুমকি দিচ্ছে, চোখ রাঙাচ্ছে। সরকারী কর্মচারীরা তাঁদের ট্রেড ইউনিয়ন করবেন কিনা বা করলেও কতটুকু করবেন, তা ঠিক করে দিচ্ছে। নিয়ন্ত্রণবিহীন সমাজ বিরোধীরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে গোটা রাজ্য জুড়ে। শুধু রাজ্য প্রশাসন ও প্রশাসনিক কাজেরই এই হতকুৎসিত চেহারা। বাইরের খুন-জখম-ধর্ষণ-দুর্নীতি-কৃষক আত্মহত্যা-শিল্পে লবডঙ্কা—এসব তো আছেই। তবে কর্মচারীরাও চুপ করে বসে নেই। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে মিছিল-সমাবেশ-গণঅবস্থান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিবাদধর্মী কর্মসূচীতে তাঁরা বিপুল সংখ্যায় সমবেত হচ্ছেন। কিন্তু এই সরকারের আচরণ থেকে স্পষ্ট, শুধু প্রতিবাদ আর স্মারকলিপিকে গুরুত্ব দেবার মতো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এই সরকারের নেই। কর্মচারীদের প্রতি সরকারের যে ধারাবাহিক বিদ্বেষমূলক আচরণ তাকে প্রতিহত করার জন্য প্রতিবাদধর্মী থেকে প্রতিরোধধর্মী কর্মসূচীতে উত্তরণ ঘটানোর সংগঠিত প্রয়াস এখন থেকেই জরুরী। কর্মচারী স্বার্থবিরোধী প্রশাসনিক কার্যকলাপ বা বাইরের রাজনৈতিক শক্তির অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে শুধু আনুষ্ঠানিক ডেপুটেশন নয়, স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রয়োজন। অগণতান্ত্রিক, কর্মচারী বিদ্বেষী এই সরকারের কাছে বার্তা পাঠানো প্রয়োজন, গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির সীমারেখার মধ্যেই পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা জঙ্গী আন্দোলনের অতীত ঐতিহ্যকে বিস্মৃত হয়নি। সময় এসেছে সেই পথেই অগ্রসর হওয়ার। প্রয়োজনে সাংগঠনিক পার্থক্য ভুলে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে। অর্জিত অধিকার যদি রক্ষা করতেই হয়, শুধু আর প্রতিবাদে 'ফোঁস' করলে চলবে না, প্রতিরোধের ছোবলও মারতে হবে। □

১ এপ্রিল ২০১৫

দুই ভাই

দুই ভাই। একান্নবর্তী পরিবারের দুই সদস্য। একজন পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, অপরজন চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিতে চলিয়াছে। বয়সের নিরিখে পঞ্চম বর্ষীয় ভ্রাতাই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রূপে স্বীকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে চিত্রটি ভিন্নরূপ। বয়সের নিরিখে অনুজ ভ্রাতাটি অধিকতর দায়িত্ব স্কন্ধে বহন করিবার জন্য দায়বদ্ধ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্বীয় স্বাধীন কর্মপরিধি থাকিলেও, প্রকারান্তরে অনুজের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। বিশেষত জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্ব-উপার্জনে সংসার প্রতিপালন নিতান্তই কষ্টসাধ্য। বহুলাংশেই নির্ভর করিতে হয় অনুজের সাহায্যের উপর। ইহা অস্বাভাবিক কোনো বিষয় নহে, স্বভাবতই আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু যাহা আলোচনার দাবি রাখে, তাহা হইল উভয় ভ্রাতার চারিত্রিক সাযুজ্য। চারিত্রিক সাদৃশ্য এইরূপ যে উভয় উভয়ের পরিপূরক বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। একই রাজনৈতিক রক্ত যে উভয়ের ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা কার্যকলাপ হইতেই স্পষ্ট হয়। ভ্রাতৃদ্বয়ের পৃথক করিয়া পরিচয় প্রদানের প্রয়োজন থাকে না। এক্ষণে কতিপয় সাদৃশ্য লইয়া চর্চা করা যাইতে পারে। যেমন, প্রথমত দুর্নীতি। উভয়েই অল্প সময়ে বিস্তর পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছে। বয়সে অনুজ কিন্তু কর্মে অগ্রজ ভ্রাতাটি সারদা, রোজভ্যালি প্রভৃতি চিটফান্ড সংস্থার সহিত দহরম-মহরম করিয়া অনৈতিক উপায়ে বিস্তর উপার্জন করিয়াছে, ঠিক তেমনই বয়সে অগ্রজ, কিন্তু কর্মে অনুজ ভ্রাতাটি ত্রিফলা, লেক মল, বিটুমিন প্রভৃতি কেলেঙ্কারির নায়ক হইয়া উঠিয়াছে। কনিষ্ঠ ভ্রাতার সময়ে যেমন রাজ্যে কৃষি ও শিল্পে হাহাকার উঠিয়াছে, তেমনই বয়সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরিচালনায় কলিকাতা শহরে সড়ক পথ, পয়ঃপ্রণালী, পানীয় জল পরিস্থিতি নিদারুণ আকার ধারণ করিয়াছে। উভয়ের জীবন দর্শন হইল 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'। অনুজ ভ্রাতা বাজার হইতে দেদার ঋণ করিয়া স্ফূর্তি করিতেছে। অগ্রজটিও তথৈবচ। তিনি আবার অনুজের নিকট হইতে ঋণ করিতেছেন, তাহাও পরিশোধ হইতেছে না। যাহাকে কহে 'চোরের ওপর বাটপাড়ি'। অগ্রজের আর্থিক অবস্থা করুণ। তথাপি অনুজের মন রাখিতে ঘোষণা করিয়াছে শহরস্থ যে কোনো ইমারতে নীল-সাদা রং করিলেই কর ছাড় মিলিবে। অবশ্য এবং বিধ অর্বাচীন ঘোষণার জন্য আদালত সম্প্রতি বিস্তর ধমক দিয়াছে।

উভয় ভ্রাতাই গণতন্ত্রের শত্রু। স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে চলিতে অভ্যস্ত। এক হাতে একাধিক দায়িত্ব কুক্ষিগত করিয়াছেন উভয়েই। বিরোধী পক্ষকে সোচ্চার না হইতে দিবার প্রয়াস উভয়েই অহরহ গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিরোধীদের আলোচনার সময় সঙ্কুচিত করিতে উভয়েই সিদ্ধহস্ত। বয়সে অগ্রজ ভ্রাতাটির রাজ্যব্যাপী উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় আত্মীয় পরিজন রহিয়াছে। তাহাদেরও চারিত্রিক গুণাবলী সমপর্যায়ভুক্ত। ইহারা সকলে মিলিয়া রাজ্যবাসীর জীবন দুর্বিষহ করিয়া তুলিয়াছে। বয়সে অগ্রজ ভ্রাতাটিকে ও তাহার পরিজনবর্গকে সমুচিত শিক্ষা প্রদানের সুযোগ এক্ষণে আসিয়াছে। যাহা দেখিলে বয়সে অনুজ ভ্রাতাটিও কিয়ৎ পরিমাণে সংযত হইতে পারে। অবশ্য 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে!'

***পুনশ্চ ঃ** বয়সে অগ্রজ ভ্রাতাটির স্থায়ী ঠিকানা কলিকাতার ধর্মতলায় এস এন ব্যানার্জী রোড এবং অনুজ ভ্রাতাটির স্থায়ী ঠিকানা মহাকরণ হইলেও বর্তমান ঠিকানা 'নবান্ন'। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।□*

১৭ চৈত্র ১৪২১

শোক সংবাদ

কমরেড রতীশ চক্রবর্তী

গত ১১ মার্চ '১৫ দুপুর ১টায় অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন মালদা জেলার কর্মচারী আন্দোলনের নেতা রতীশ চক্রবর্তী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। উল্লেখ্য, প্রয়াত রতীশ চক্রবর্তী১৯৭২ সালে মালদা জেলার কালিয়াচক থেকে চাকুরিতে যোগদান করেন। পরে ১৯৭৪ সালে মৎস্য দপ্তরে অবর-সহ বাস্তুকার পদে যোগদান করেন। ২০০৯ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। চাকুরীর শুরু থেকেই তিনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ক্রমে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতার জন্য তিনি নিজস্ব এ্যাসোসিয়েশনের ও জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে আসীন হন। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত তিনি যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব প্রতিপালন করেন। পরে জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব এবং সভাপতির দায়িত্বও নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালন করেন। ১৯৮৩ সাল থেকে ২০১৩ সব পর্যন্ত তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। একই সাথে তিনি জেলার কর্মচারীদের মূল গণসংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, মালদা জেলা শাখার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে ১৯৮৬ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। জেলার কর্মচারীদের প্রতি ছিল তার অকুণ্ঠ ভালোবাসা। সংগঠনের প্রতি ছিল তাঁর অবিচল আস্থা। তাঁর সহজ-সরল জীবন যাপন এবং আচার-আচরণেও তিনি ছিলেন অনুকরণীয়। তিনি রেখে গেছেন একমাত্র কন্যা, স্ত্রী, ছয়ভ্রাতা, দুই ভগ্নী এবং অসংখ্য কর্মচারী সহ-যোদ্ধাদের। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর খবর জানার পরে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির, পঃ বঃ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন, মালদা জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ কর্মচারীরা বাড়িতে গিয়ে পরিবার বর্গকে সমবেদনা জানান। পরে কর্মচারী ভবনে প্রয়াত নেতার মরদেহ আনা হলে সেখানেও তাঁকে অসংখ্য কর্মচারী, নেতৃবর্গ এবং অন্যান্যরা শেষ শ্রদ্ধা জানান।□

কমরেড অশোক ব্যানার্জী

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির লবণহ্রদ অঞ্চলের প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির কলকাতা জেলার কোষাধ্যক্ষ অশোক কুমার ব্যানার্জী গত ১৭ মার্চ ২০১৫ রাত ৮টা নাগাদ এক মর্মান্তিক রেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। সংগঠনের কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে মধ্যমগ্রাম স্টেশনে রেললাইন পার হতে গিয়ে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জামাতা ও পৌত্র বর্তমান।

কমরেড ব্যানার্জী ৩০ নভেম্বর ১৯৫০ মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা মহকুমার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩ আগস্ট ১৯৭১ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা অধিকারে চতুর্থ শ্রেনী কর্মচারী হিসেবে যোগদান করেন এবং ৩০ নভেম্বর ২০১০ প্রধান সহায়ক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। পরবর্তী পদোন্নতির জন্য যোগ্যতামান উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পদোন্নতি গ্রহণ করেন নি। শুরু থেকেই তিনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সঙ্গে যুক্ত হন। ধীরে ধীরে তিনি কর্মচারী সংগঠন-আন্দোলনের একজন দক্ষ সৈনিকরূপে নিজেকে তৈরি করেন। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি র লবণহ্রদ অঞ্চলের যথাক্রমে দপ্তর সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে গুরুদায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালন করেছে। অবসর গ্রহণের পর পেনশনার্স সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন ঐ সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির কোষাধ্যক্ষ। কমরেড বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকায় ম্যানেজারিয়াল টিমের সদস্য ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে কমরেড অশোক ব্যানার্জী স্মরণসভা ২ এপ্রিল ২০১৫ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হলে অনুষ্ঠিত হবে। □

কেন্দ্রীয় বাজেট ঃ অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট করলেন সরকারের কর্পোরেট দৃষ্টিভঙ্গী

উৎসর্গ মিত্র

সমস্ত আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণিত করেই গত ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ সংসদে পেশ হল এক জনবিরোধী বাজেট। আরো খারাপ বিষয় হল, বাজেট পেশের সময়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি সামাজিক সুরক্ষা, উন্নয়ন এবং 'দরিদ্র নারায়ণ'দের জন্য কল্যাণের কথা ঘোষণা করলেও বাস্তবে কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ক্ষেত্র ও কল্যাণমূলক প্রকল্পে নজিরবিহীন মাত্রায় বরাদ্দ ছাঁটাই করেছেন। স্বাধীনোত্তর ভারতে এ ঘটনা এর আগে কখনোই ঘটেনি।

গ্রামোন্নয়ন খাতে বরাদ্দ হ্রাস নজরকাড়া। বাজেট প্রস্তাবের কেন্দ্রীয় যোজনা বরাদ্দ অনুযায়ী ২০১৩-১৪ সালে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ৫১,৭৫৭ কোটি টাকা। এ বারে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩,১৩১ কোটি টাকায়। গ্রামীণ আবাসন ধরে, কিন্তু গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ বাদ দিয়ে এই হিসেব করা হয়েছে। যোজনা ও যোজনা বহির্ভূত বরাদ্দ ধরে ইন্দিরা আবাসন যোজনাতেই বরাদ্দ কমেছে ৮,২০০ কোটি টাকা। গতবারে ছিল ১৮,০০০ কোটি টাকা, হয়েছে ১০,০০০ কোটি টাকা। বাজেট ভাষণে রেগা প্রকল্প ধরে গ্রামোন্নয়ন খাতে যে বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে, দেখা যাচ্ছে, সেটিরও পরিমাণ গতবারের তুলনায় ১০ শতাংশ কম। কৃষিতে যোজনা বরাদ্দ ২০১৩-১৪ সালে ছিল ১১,৭৮৮ কোটি টাকা, ২০১৪-১৫ সালে তা দাঁড়ায় ১১,৫৩১ কোটি টাকায়। এবারে তা হয়েছে ১১,৬৫৭ কোটি টাকা। কাগজে কলমে পরিমাণ বাড়লেও বাস্তব ক্ষেত্রে তার পরিমাণ এতই নামমাত্র যে, এখনকার মূল্যবৃদ্ধির যুগে তা আসলে কিছুই নয়। বিস্ময়কর হারে বরাদ্দ কমেছে সেচে। ২০১৪-১৫ সালে যে বরাদ্দ ছিল ১,৭৫৭ কোটি টাকা, এবারে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৭৭২ কোটি টাকায়।

বড়ো ধাক্কা খেয়েছে শিক্ষা। বাজেট থেকে এটা স্পষ্ট যে, কেন্দ্রীয় সরকার আর শিক্ষার দায় বহন করতে রাজি নয় এবং একে তারা বাজারী পণ্যে পরিণত করতে চায়। এ কারণেই শিক্ষায় মোট বরাদ্দ ছাঁটাই করা হয়েছে ১৬ শতাংশ। স্কুল শিক্ষায় বরাদ্দ গত বছরের ৫৫,১১৫ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ৪২,২১৯ কোটি টাকা। সর্বশিক্ষায় বরাদ্দ ৬,০০০ কোটি টাকা কমে দাঁড়িয়েছে ২২,০০০ কোটি টাকা। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানে ১,৫০০ কোটি টাকা কমে গেছে। ব্লক স্তরে মডেল স্কুল গঠনে মাত্র ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করে কার্যত কেন্দ্র আর কোনো সাহায্য করবে না বলেই জানিয়ে দিয়েছে। গতবারে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ১,০৭৪ কোটি টাকা। বরাদ্দ কমেছে উচ্চ শিক্ষা খাতেও। গবেষণা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী অনেক কথা বললেও, এমনকি আই আই টি এবং বিজ্ঞান চর্চার মুখ্য কেন্দ্রগুলির বরাদ্দও কমানো হয়েছে।

ভাষণে স্বাস্থ্য বীমা নিয়ে অনেক কথা বললেও সরকার তার নিজস্ব স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্প অর্থাৎ সি জি এইচ এস-এ বরাদ্দ কমিয়েছে প্রায় ১৬ শতাংশ। অর্থাৎ স্বাস্থ্য প্রকল্পে এটি বেসরকারীকরণের একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। পঞ্চায়েত দপ্তরকে তুলে দেয়ার পদক্ষেপ স্পষ্ট মোদি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে—মাত্র ৯৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এই খাতে। বলা হয়েছে এখন যেহেতু রাজ্যের হাতেই পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রকল্পের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সেহেতু এই মন্ত্রকের নাকি আর বিশেষ কোনো কাজই নেই। এর অর্থ হচ্ছে, এই দপ্তরকে অদূর ভবিষ্যতে তুলেই দেবে সরকার।

এমনকি আদিবাসী বা তপশীলি উপজাতিভুক্ত মানুষেরাও বঞ্চিত হয়েছেন এই বাজেটে। তপশিলী সাব প্ল্যানের বরাদ্দ ৪৩,০০০ হাজার কোটি টাকা থেকে কমিয়ে করা হয়েছে মাত্র ৩০,০০০ কোটি টাকা। অন্য দিকে আদিবাসী সাব প্ল্যানে গত বারের ২৬,০০০ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে করা হয়েছে মাত্র ১৯,০০০ কোটি টাকা।

বাজেটে স্তম্ভিত করে দেওয়ার মতো আরও একটি বরাদ্দ হ্রাসও হয়েছে। নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকে এই বরাদ্দ এ বারে ৫৬ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে। ভাষণে নারী কল্যাণের জন্য প্রচুর শব্দ ব্যয় করলেও অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে বরাদ্দ গতবারের তুলনায় ২৫ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে। ইউ পি এ সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেটের সাথে তুলনা করলে এই বরাদ্দ হ্রাসের পরিমাণ আরও বাড়বে। ২০১৩-১৪ সালে ইউ পি এ সরকার তাদের শেষ বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ করেছিল ১,৭৯২ কোটি টাকা, আর এবারে সেই

বরাদ্দ কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৯৮৯ কোটি টাকায়। অর্থাৎ নাগরিক জীবনের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। এর প্রভাব অবশ্যই পড়বে এবং বেশ চড়া ভাবেই পড়বে আম জনতার ঘাড়ে।

আম জনতার ঘাড়ে কোপ পড়া শুরু হয়েছিল সেই রেল বাজেট থেকেই। খাদ্য শস্য, সার, কয়লার মতো পণ্যের পরিবহন খরচ বাড়িয়ে দিয়ে মূল্য বৃদ্ধির আগুনে ঘি ঢালার ব্যবস্থা করেছিল রেল মন্ত্রক। সাধারণ বাজেটেও সেই একই ধারা বজায় রাখা হল। বাজেটে কয়লার উপরে সেস দ্বিগুণ করে দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। বিদ্যুতের খরচ বাড়া তাই এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র। আর সে খরচ যদি চড়া হারে বেড়ে যায়, তো প্রায় সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দামও বাড়তে বাধ্য। জলবায়ু পরিবর্তনের আবহে সর্বাধিক জোর দেওয়া হচ্ছে 'ক্লিন এনার্জি'র উপরে। এই ক্ষেত্রে গবেষণা ও কাজের জন্য অর্থের যোগান দিতে কয়লা, পিট ও লিগনাইটের ওপর সেস বসানো হয়েছিল। গত বাজেটেই সেই সেসের পরিমাণ টন প্রতি ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০ টাকা করা হয়েছিল। এই বাজেটে তা বাড়িয়ে এক লাফে করা হয়েছে ২০০ টাকা। কোল ইন্ডিয়ার সূত্রে খবর এর ফলে বিদ্যুতের দাম ইউনিট পিছু চার পয়সা করে বাড়তে পারে। সেস বাড়ায় বিজ্ঞানীরা হয়তো খুশি হবেন, কিন্তু এর ফলে আম জনতার ঘাড়ে কোপ পড়াটা নিশ্চিত হয়ে গেল।

পাশাপাশি বাজেটে আয়করের ছাড়ের পরিধি না বাড়ানোয় স্বাভাবিক ভাবেই মধ্যবিত্তরা অসুবিধায় পড়বেন। এর সাথে সার্ভিস ট্যাক্স ১২.৩৪ শতাংশ থেকে ১৪ শতাংশ করায় প্রায় সর্বক্ষেত্রে চাপ বাড়বে। রেস্তোরাঁয় এর আগে ১০০০ টাকা বিল হলে সার্ভিস ট্যাক্স দিতে হত ১২৩ টাকা, এখন দিতে হবে ১৫০ টাকা। একই ভাবে খরচ বাড়বে বিমান, কয়েকটি ট্রেন, বীমার প্রিমিয়ামের ক্ষেত্রেও। এর ফলে সরকারের ভাণ্ডারে অর্থ আসবে সন্দেহ নেই, কিন্তু আম জনতার নাভিশ্বাস উঠে যাবে, এতেও কোনো সন্দেহ নেই। প্রবীণ নাগরিকদের স্বাস্থ্য বীমায় ছাড়ের ক্ষেত্রে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হলেও অন্য দিক দিয়ে যে ভাবে মারার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে তাঁদেরও জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে আগামী দিনে।

অস্বাভাবিক ভাবে বাড়ানো হয়েছে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের বাজেটে। মুখে চীনের জুজু দেখিয়ে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে ১১ শতাংশ, কিন্তু আমরা জানি এর পিছনের আসল উদ্দেশ্য কি। আমেরিকা এবং তার যোগ্য দোসর ইস্রায়েলের অস্ত্র ব্যবসায়ে মন্দা কাটাতেই এই পদক্ষেপ—এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

এক কথায় এ বাজেট কর্পোরেট জগতের মানুষদের মুখ চেয়েই করা হয়েছে—সাধারণ মানুষ ব্রাত্য এখানে। কর্মসংস্থান, দেশের আর্থিক বৈষম্য হ্রাস, উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ইত্যাদির কোনো কথাই নেই এই বাজেটে। কর্পোরেট কর ৩০ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে নামিয়ে এনে সম্পদ সংগ্রহের পথকে সঙ্কুচিত করা হয়েছে। শুরু থেকেই এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলেছে সরকার। ২০১৪-১৫ সালে সরকারের রাজস্ব বাবদ আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৩.৬ লক্ষ কোটি টাকা। বছরের শেষে আয় হয়েছিল ১২.১৪ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ সালে সেই লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানোর বদলে কমিয়ে রাখা হয়েছে ১৩ লক্ষ কোটি টাকা। তার মানে গরিব মেহনতী মানুষের জন্য আয়ের কোনো উদ্দেশ্যই নেই সরকারের। বড়লোকেদের সাহায্য করার জন্যই সম্পত্তি কর তুলে নেওয়া হয়েছে একেবারে। কালো টাকা উদ্ধারের কোনো ইতিবাচক কথাও এই কারণে নেই এই বাজেট বক্তৃতায়। অদ্ভুতভাবে ভারতের মতো উন্নয়নশীল একটা দেশের অর্থমন্ত্রী এমন বাজেট পেশ করছেন, যেখানে ব্যয়ের থেকে আয়ের পরিমাণ বেশি দেখানো আছে। অর্থাৎ স্পষ্টতই সরকার তার দায় থেকে হাত গুটিয়ে নিতে চাইছে। বোঝাই যাচ্ছে যে এখন থেকে সরকারের কাজ হবে শুধুই বিদেশী বিনিয়োগকারী, ফাটকাবাজ, কালোবাজারী আর ব্যবসায়ী শ্রেণীকে উৎসাহ দেওয়া। এর সাথে আবার যুক্ত হচ্ছে দ্বিচারিতার দিকটিও, কারণ মুখে বলা হচ্ছে আম আদমীর কথা, আর কাজে করা হচ্ছে বড়লোক তোষণ। কিন্তু যাই করুন না কেন, বেকারী, ক্ষুধা, দারিদ্র্যের বিনিময়ে কাদের স্বার্থে বাজেট করলেন অর্থমন্ত্রী, তা তিনি লুকাতে পারেন নি কিছুতেই। এক জনবিরোধী বাজেটের সব ধর্ম বর্তমান এর প্রতি ছত্রে। সার্বিকভাবেই এর বিরোধিতা করার দরকার তাই। □

রেলবাজেট গরীব মানুষের কাছে নির্মম পরিহাস

শাশ্বতী মজুমদার

২০১৫-১৬ বর্ষের জন্য ২৬ ফেব্রুয়ারি রেল বাজেট পেশ করেছেন রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু। ভারতীয় রেল বিগত কয়েক বছর ধরেই আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে চলছে, এই অজুহাতে পণ্যশুল্ক এবং যাত্রীভাড়া বৃদ্ধির নতুন আর এক দফা বোঝা মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপে ইতিমধ্যেই আক্রান্ত মানুষের ওপর চাপানো হবে কিনা, সেই বিষয়ে আশঙ্কা ছিল। যাত্রীভাড়া না বাড়ায় মানুষ একটু হাপ ছেড়ে বাঁচলেও ভুলে গেলে চলবে না ডিজেলের দাম কমার জন্য কোনো বাড়তি ছাড় যাত্রীদের মেলেনি। দাম বেড়েছে প্ল্যাটফর্ম টিকিটের।

পণ্যমাশুল বেড়েছে দারুণভাবে। কয়লা পরিবহনের মাশুলে ৬.৩ শতাংশ, লৌহ আকরিকে ২.৭ শতাংশ, সিমেন্ট ও স্টিলে .৮ শতাংশ, ইউরিয়া ও খাদ্যশস্যের ১০ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। রান্নার গ্যাস ও কেরোসিনে মাশুল বেড়েছে .৮ শতাংশ। রেলমন্ত্রীর বক্তব্য, মাশুল বাড়িয়ে রেলের বাড়তি আয় হবে ১৪ হাজার কোটি টাকা। খাদ্যশস্যের ওপর বিপুল মাশুল জনগণের কাছে নির্মম পরিহাসের মতো শোনাচ্ছে। সারের দাম বাড়ায় বাড়বে চাষের খরচ। কৃষক আত্মহত্যার ভয়াবহ পরিস্থিতিতে এই ব্যয়বৃদ্ধিতে কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষ আরও বিপন্নতার মধ্যে পড়বেন।

অন্যদিকে, ভারতের মতো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে রেল পরিষেবার মাধ্যমে সস্তায় পরিবহনের সুযোগ পৌঁছে দেবার বা বৃদ্ধি করার যে দায়িত্ব রেলমন্ত্রকের থাকে, তার কোনো প্রতিফলন নেই রেল বাজেটে। সম্ভবত এই প্রথম রেল বাজেট পেশ হল একটিও নতুন সম্প্রসারণ প্রকল্প এবং একটিও নতুন ট্রেন ঘোষণা ছাড়া। এটা ঠিকই যে নতুন প্রকল্প, নতুন ট্রেন ঘোষণার ক্ষেত্রে বহু সময়েই সস্তা রাজনৈতিক চমক থাকে। কিছুকাল আগে এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন কেন্দ্রে রেলমন্ত্রী ছিলেন, তখন একই ট্রেনকে একাধিক নাম দিয়ে নতুন ট্রেনের ঘোষণা, বরাদ্দ ছাড়া বা নামমাত্র বরাদ্দে প্রকল্প ঘোষণার ধাপ্পা, এসবই আমরা দেখেছি। কিন্তু রেল বাজেটে নতুন ট্রেনের শিকে ছিড়বে এই প্রত্যাশা নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে গরীব মানুষেরা বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করেন, তাদের কথা ভাবার দায় তাহলে কার? আর, এই যে এবার কোনো নতুন ট্রেনের প্রস্তাব না রাখা, এটাও কি রাজনৈতিক সততার পরিচয় বলে মানুষ মেনে নিচ্ছেন? নাকি বার বার ঘর পোড়ার অভিজ্ঞতায় সিঁদুরে মেঘ দেখছেন তাঁরা—মনে করছেন রেল প্রকল্পগুলিকেও বেসরকারী হাতে তুলে দেবার পূর্বাভাস এটা?

নতুন ট্রেন ঘোষণা না হলেও অন্য চমক থাকছেই। বিশেষ করে খোদ প্রধানমন্ত্রীর চমকপ্রদ কর্মসূচী 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া', মেক ইন ইন্ডিয়া' আর 'স্বচ্ছ ভারত'-এর স্লোগানের সঙ্গে সঙ্গতি

বিধানের সতর্ক প্রচেষ্টা ধরা পড়েছে রেলমন্ত্রীর প্রস্তাবনায়।

বাজেট পেশ করার আগে রেলমন্ত্রী একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেন যাতে 'আগামীদিনের রেলপথ'-এর চ্যালেঞ্জকে তুলে ধরা হয়েছে। ঐ পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে বিগত কয়েক বছর ধরে ভারতীয় রেলে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দৈন্য চলছে। এরজন্য যেমন রেলের পরিবহন ক্ষমতা বাড়ানো যায় নি, তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যাত্রী পরিষেবা। প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটানো যায়নি এবং যাত্রী সুরক্ষায় বিনিয়োগও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। প্রভুর বক্তব্য— এই দুষ্ট চক্র থেকে বেরিয়ে তিনি বিনিয়োগ আনতে চান যাতে রাজস্ব বাড়ে এবং উন্নত পরিষেবা প্রদান করা যায়। আগামী ৫ বছরের ৮.৫ ট্রিলিয়ন টাকা বিনিয়োগের আশা করছেন তিনি। বলা হয়েছে ভারতীয় রেলওয়ের 'ভিশন ২০৩০' পরে প্রকাশিত হবে, যাতে থাকবে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের প্রসঙ্গ।

মোদি সরকারের সামগ্রিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সেই 'ভিশন'-এ রেলে ব্যাপক কর্পোরেটাইজেশনের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করার প্রচেষ্টা হবে মনে করলে বোধ হয় ভুল হবে না।

ট্রেনে মহিলা কামরা ও কিছু বাছাই করা কামরায় সুরক্ষার জন্য নজরদারি ক্যামেরা বসানোর পাইলট প্রকল্প চালু করার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে নির্ভয়া ফাণ্ডের অর্থ ব্যবহার করা হবে। এতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। মহিলাদের সুরক্ষার জন্য এই উদ্যোগকে কেউ কেউ ভাল বললেও, একাংশের বক্তব্য, সিসি টিভি-র ভয় অপরাধীদের বিরত করতে পারে না। বরং এতে গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হবার আশঙ্কাই বেশি, বিশেষত যেখানে কিছুদিন আগেই দিল্লীর মেট্রোর সিসিটিভির ফুটেজ থেকে মহিলা ও দম্পতিদের ছবি পাচার হয়ে ইন্টারনেটে অশ্লীলভাবে প্রদর্শনের নমুনা দেখা গেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রভু বলেছেন, ভারতীয় রেল যদিও দুরবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার মধ্যে 'আকাশে ওড়বার ক্ষমতা রয়েছে, তাকে অসাধারণ উচ্চতায় তুলে নিয়ে যাওয়া যায়।' আমরা বলব, আকাশে ওড়ার উচ্চাশা ভাল কিন্তু মি. প্রভু

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে)

অভিজ্ঞতার আলোকে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

বিষয়	২০১০ পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট পরিচালিত পুরবোর্ডের সময়	২০১০ পরবর্তী তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুরবোর্ডের সময়	পর্যবেক্ষণ
● পৌরসভার আর্থিক অবস্থা ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে।	● বামফন্ট পরিচালিত পৌরর্বোর্ডের শেষ বছরে (২০০৯-১০) মোট আয় হয়েছিল (সংশোধিত) ২৪৭৪ কোটি টাকার বেশি।	● ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে সংশোধিত আয় দাঁড়ায় প্রায় ২১৮৯ কোটি টাকা।	● আয় কমেছে ২৮৫ কোটি টাকা।
● বাজেটে প্রারম্ভিক তহবিলে উদ্বৃত্ত থেকে ঘাটতি।	● ২০১০ সালের ১ এপ্রিল পর্যন্ত প্রারম্ভিক তহবিল উদ্বৃত্ত ছিল (+) ৩৭৭ কোটি ৮৫ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা।	● তৃণমূল পরিচালিত নতুন বোর্ডের প্রথম বছরের শেষে অর্থাৎ ২০১১ সালের ১ এপ্রিল প্রারম্ভিক তহবিলে ঘাটতি দাঁড়ায় (–) ১০৬ কোটি ২৮ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা। পরের বছরে ১ এপ্রিল ২০১২ তে প্রারম্ভিক ঘাটতি (–) ৩৫৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। ২০১৪-১৫ বাজেটে বলা হচ্ছে ৩১/৩/২০১৫-তে ক্রমপুঞ্জিভূত ঘাটতি দাঁড়াবে (–) ৫০৫ কোটি ৮০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। যা ৫ বছরের রেকর্ড।	● ঘাটতি দ্রুতহারে বেড়েই চলেছে।
● বস্তি উন্নয়নে বরাদ্দ হ্রাস, অথচ কলকাতা শহরের এক তৃতীয়াংশ মানুষ বস্তিতে বসবাস করেন। ছোট বড় মিলিয়ে বর্তমানে বস্তির সংখ্যা ৩৩৩৩ টি।	● বাম আমলের শেষ বছরে (২০১০-১১) এই খাতে বরাদ্দ ছিল ১২৯ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। এই আমলে বস্তিবাসীদের জন্য পরিকাঠামোগত, পানীয় জল সংক্রান্ত ও অন্যান্য নানা সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছিল।	● ২০১৪-১৫ বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ হয়েছে ১২৫ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। বস্তি ভেঙে বহুতল তৈরি হচ্ছে। আদপে কলকাতার গরীব মানুষের থাকার ব্যবস্থা বিলোপ করার প্রক্রিয়া চলছে।	● চার বছর বাদে বরাদ্দ হ্রাস ৪ কোটি ১ লক্ষ টাকা। বস্তিবাসীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের উপাদানের মূল্যবৃদ্ধির কথা বিবেচনায় রাখলে প্রকৃত বরাদ্দ হ্রাস আরও বহুগুণ বেশী।
● সড়ক/রাস্তা উন্নয়নে বরাদ্দ হ্রাস।	● ২০১০-১১সালে বিগত পৌরবোর্ডের বাজেট পেশের সময় ওয়ার্ডের সংখ্যা ছিল ১৪১টি। বরাদ্দ হয়েছিল ২৭৬ কোটি ১২ লক্ষ টাকা।	● ২০১৪-১৫ সালে বাজেট পেশের সময় ওয়ার্ডের সংখ্যা ১৪৪ টি। বরাদ্দ হোল ২৬২ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা।	● ওয়ার্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও চার বছর বাদে বরাদ্দ হ্রাস হলো ১৩ কোটি টাকা।
● পয়ঃপ্রণালী ও নিকাশী খাতে বরাদ্দ হ্রাস।	● বাম আমলের শেষ বাজেটে (২০১০-১১) এই খাতে বরাদ্দ ছিল ২২৭ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। পুরনো নিকাশী ব্যবস্থা ভেঙে নতুন নিকাশী ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল।	● ২০১৪-১৫ বাজেটে বরাদ্দ হয় ২২১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। বেহালা, গার্ডেনরীচ বা পূর্ব কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জল জমার সমস্যার সমাধানে কার্যকরী পরিকল্পনা হয়নি।	● ওয়ার্ড সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪১ থেকে ১৪৪ হলেও চার বছরে বরাদ্দ হ্রাস ৬ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা।
● পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা।	● বাম আমলে ধাপায় ৩০ এম জি ডি ক্ষমতা সম্পন্ন জলপ্রকল্পের কাজ শুরু হয় ২০০৯ সালের শেষে। পলতা থেকে টালা নতুন করে ৬৪ ইঞ্চি পাইপলাইন বসিয়ে পানীয় জলের জোগান বৃদ্ধি করা হয়েছিল।	● বর্তমান বোর্ড এখনও প্রকল্পের কাজ শেষ করতে পারেনি। বর্তমান পৌরবোর্ড বিগত প্রায় ৫ বছরে তেলিপাড়া বুস্টিং কেন্দ্র সহ বাম পুরবোর্ডের আমলে চালু হওয়া একাধিক জল প্রকল্পের কাজ শেষ করতে পারেনি। শহরের বড় অংশের মানুষ এখনও পরিশ্রুত পানীয় জল পায় না।	● জল সঙ্কটের সমস্যা লঘু করে দেখে গঙ্গা পাড় ও শহরের তথাকথিত সৌন্দার্যায়নে অবাধ টাকা খরচ হচ্ছে।
● ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের পথে চলা শুরু।	● বাম আমলে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে মেয়র পরিষদ ও ১৫টি বোরো কমিটি গঠিত হয়। আইন অনুযায়ী (কে এম সি অ্যাক্ট ১৯৮০-এর ১১ ধারা) প্রতি ওয়ার্ডে 'ওয়ার্ড কমিটি' সক্রিয় ছিল।	● বর্তমান পৌরবোর্ডের আমলে সম্পত্তি কর থেকে বিল্ডিং, পানীয় জল সহ ৭টি জরুরী দপ্তর মেয়র পারিষদদের না দিয়ে মেয়র তাঁর নিজের হাতেই রেখে দিয়েছেন। 'ওয়ার্ড কমিটি' ২০১০-এর পর থেকে কার্যকরী না করে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।	● ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ হচ্ছে।

বর্তমান পুরবোর্ডের নানা কীর্তির সাতকাহন

● ত্রিফলা আলো দুর্নীতি — 'ট্রাইডেন্ট' আলো বা ত্রিফলা আলো দিয়ে শহর সাজানোর ক্ষেত্রে প্রায় ৩০ কোটি টাকা দুর্নীতি ধরা পড়ে। 'স্পেশাল অডিট রিপোর্ট' অধিবেশনে পেশ করার জন্য বারে বারে বিরোধী পক্ষের দাবি উপেক্ষা করা হয়েছে। এমনকি মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটির দাবিকেও উপেক্ষা করা হয়।

● বিটুমিন দুর্নীতি — ৯ কোটি টাকার বিটুমিন কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে তার কোন রেকর্ড নেই। বিষয়টি সম্পর্কে অডিট রিপোর্টে উল্লেখ আছে।

● বিজ্ঞাপন দুর্নীতি — হোর্ডিং বোর্ড-এর ক্ষেত্রে পৌরসভার প্রাপ্য ১৬ কোটি টাকা সংক্রান্ত তথ্য কম্পিউটার থেকে মুছে ফেলার দুর্নীতি ও বেনিয়মের চাঞ্চল্যকর নজির সৃষ্টি করেছে বর্তমান পুরবোর্ড। সি এ জি-ও এই বিষয়টি সম্পর্কে রিপোর্ট চেয়েছে। ইন্টারন্যাল অডিট রিপোর্টেও আগেই উল্লেখ করা হয়েছে চারটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা কোটি কোটি টাকার বরাত পেয়েছে। তাদের দেয় কয়েক কোটি টাকা কর্পোরেশনে বকেয়া রয়েছে। যেমন, ৮ কোটি টাকা পর্যন্ত একটি সংস্থার বাকি ছিল। বাকিদের বড় অংকের বকেয়া ছিল। এত বকেয়া থাকার কারণে তারা পরবর্তী টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে পারছিলেন না। তাই রাতারাতি তাদের সব বকেয়া রেকর্ড কম্পিউটার থেকে মুছে ফেলা হয়।

● বর্তমান বোর্ডের আমলে বে-আইনী বাড়ির সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। গত ৫ বছরে এই শহরে একটিও বেআইনী বাড়ি ভাঙা হয়নি। অথচ আগের ৫ বছরে বামফ্রন্ট আমলে ৩০০টি বেআইনী বাড়ি ভাঙা হয়েছিল। 'প্রোমোটার রাজ'-কে কার্যত স্বীকৃতি দিয়ে সম্প্রতি পুরসভার একটি সার্কুলারে বলা হয়েছে — বাড়ির 'সার্টিফিকেট অফ কমপ্লিসন (সি সি)' না পেলেও জলের লাইন দিয়ে দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে প্রোমোটারদেরসুবিধা করে দেওয়া হোল।

● লেক মল দুর্নীতি — 'লেক মার্কেটকে 'লেক মল'-এ পরিণত করার প্রকল্প ১৯৮৭ সালের জুন মাসে নেওয়া হয়। বিগত বছরের ১লা বৈশাখ উক্ত প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উক্ত প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে ৬০ বছরের লীজ চুক্তি ভেঙ্গে M/s Arun Plastics Pvt. Ltd. থেকে M/ sVenkatesh Foundation Pvt. Ltd. কে হস্তান্তরিত করা হয়। এই ভেঙ্কটেশ ফাউন্ডেশন সংস্থাটি আসলে ভেঙ্কটেশ ফিল্মস-এর কর্ণধার শ্রীকান্ত মেহতার আরেকটি সংস্থা। এই ব্যক্তি তৃণমূল ঘনিষ্ঠ হিসাবেই পরিচিত। অতীতের ৬০ বছরের লীজ চুক্তি ভেঙ্গে ৩০ বছর করে দুই ভাগের রেজিস্ট্রেশনের চুক্তি হয়। এর কারণ হল ৩০ বছরের বেশি সময়ের লীজ হলে সরকারী আইনানুযায়ী বাজার দরের ৭ শতাংশ স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হয়। লেক মলের বাজার দর প্রায় ৩৩৫ কোটি টাকা। ৭ শতাংশ মানে ২৪ কোটি টাকার উপর স্ট্যাম্প ডিউটি ভেঙ্কটেশ ফাউন্ডেশনের বাঁচানো হোল। অর্থাৎ রাজ্য সরকারের ২৪ কোটি টাকার রেভেনিউ ক্ষতি করে একটি সংস্থা, যার মালিক তৃণমূল ঘনিষ্ট, তাকে এই সুবিধা দেওয়া হোল। এই চূড়ান্ত অনিয়মের (দুর্নীতির ভিত্তিতে) বিষয়ে ২ জানুয়ারি ২০১৫ সি এ জি রিপোর্ট চেয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিরোধীরা সোচ্চার হলেও বর্তমান পৌরবোর্ড ও রাজ্য সরকার নীরব।

কোষাগারের ভাঁড়ে মা ভবানী

● আসন্ন পৌরভোটকে সামনে রেখে বিভিন্ন খাতে ৪০০ কোটি টাকা খরচের জন্য বর্তমান পৌরবোর্ড বাম আমলে সঞ্চিত প্রায় ৫০০ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার 'Fixed Deposit of General Fund (2009-10)-টিকে ভেঙ্গে ফেলেছে।

● বর্তমান আমলে কর আদায় কমেছে। অন্যদিকে ১৮ নভেম্বর ২০১৪ কর্পোরেশনের আইন পরিবর্তন করে নীল-সাদা রঙের বাড়ি করলে কর ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

● কোষাগারের হাল ফেরাতে এখন জমিবিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বর্তমান পুরবোর্ড। বাইপাসস্থিত ১২ একরের জমি বিক্রির পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

● কলকাতা পুরসভার কাছে বিভিন্ন সংস্থার প্রচুর বকেয়া রয়েছে। শুধুমাত্র ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন (সি ই এস সি) কলকাতা পুরসভার কাছে পায় ৩৫০ কোটি টাকা।

● অনুদানে পক্ষপাতিত্ব — নিছক পক্ষপাতিত্বকে ভিত্তি করে ক্লাবগুলিকে অনুদান দেওয়া হচ্ছে। ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে যে যে ওয়ার্ডে তৃণমূল কাউন্সিলর রয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে নাম নিয়ে ক্লাবগুলিকে বিশেষ অনুদান হিসাবে ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। ২০১২ থেকে ১০ জানুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলার ৭ হাজার ক্লাবকে ২ লক্ষ করে টাকা দেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুরভোটকে সামনে রেখে ভোট বৈতরণী পার হতে কেবল শাসক দলের ঘনিষ্ঠ ক্লাবগুলিকে অনুদান দেওয়া হচ্ছে। □

মানস কুমার বড়ুয়া
মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী

অভিজ্ঞতার আলোকে রাজ্যে পৌর পরিষেবা

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার আগে পৌর প্রধান, কমিশনর বা কাউন্সিলরদের বিশেষ কিছু ক্ষমতা ছিল না। এই পদগুলি ছিল অনেকটা সম্মানীয় পদ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পরে প্রথমেই ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় পৌর আইন বা কলকাতা পৌরসভা আইনের ব্যাপক সংশোধন হয়। এই সংশোধনের লক্ষ্য ছিল পৌর সভাগুলিকে স্থানীয় সরকারে পরিণত করা। শুরু হয় প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নিয়মিতভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা, ১৮ বছর বয়স্ক নাগরিকদের ভোটদানের অধিকার এবং মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ। এসবের মধ্য দিয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রকৃত প্রতিনিধি হয়ে ওঠে পৌরসভাগুলি। রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে পৌর পরিচালনার সুফল দেখেই ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আনতে বাধ্য হন, যার মধ্য দিয়ে পৌরসভাগুলি সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়, পৌরসভার নাগরিকরা কী কী ধরনের পরিষেবা পেতে পারে তা নিয়েও সংবিধান যুক্ত করা হয় একটি তপশীল দ্বাদশ তপশীল, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নিয়মিত নির্বাচন ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ—পৌরসভাকে কেন্দ্র করে এই দুটি বিষয়ের উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছিল। তাই পৌরসভাগুলিতে ওয়ার্ড কমিটি গঠন, তার সভা করা, নাগরিকদের কাছে তার জবাবদিহি করা, বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করা ইত্যাদি বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। পরে ওয়ার্ড কমিটি নিয়ে এরিয়া কমিটি গঠন ও পাবলিক ডিসক্লোজার মেনে চলার জন্যেও আইন সংশোধন করা হয়। বামফ্রন্ট সরকারই চালু করেছিল প্রতিটি পৌরসভায় প্রতি বছর সি এ জি অডিট করার। এছাড়াও তখন ইন্টার্নাল ও সোশ্যাল অডিট করাকেও উৎসাহিত করা হত। এর কারণ ছিল, বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকেই পৌরসভাগুলি প্রতি বছরই রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে প্রচুর আর্থিক অনুদান পেতে শুরু করেছিল। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ মতো অর্থও পেত পৌরসভাগুলি।

এছাড়াও বামফ্রন্টের সময়ে ৩৫টি নতুন পৌরসভা, ৫টি নতুন পৌর কর্পোরেশন এবং বেশ কয়েকটি নোটিফায়েড অথরিটি গঠিত হয়েছিল। এছাড়াও ৯টি ডেভলপমেন্ট অথরিটিও গঠিত হয়েছিল।

বামফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র নাগরিক পরিষেবার মধ্যেই পৌরসভার কার্যক্রমকে আটকে রাখা নয়, পৌরসভার

অন্তর্গত নাগরিকদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রেও কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করা, তাই বস্তিকে উচ্ছেদ করে নয়, বস্তিকে রেখেই শহরের উন্নয়ন করার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বামপন্থী পৌরবোর্ডগুলি বস্তির বাড়ি, পয়প্রণালী, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত করেছে। বিভিন্ন পৌরসভায় পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের জন্য ২ কাঠা করে বাস্তুজমি পাট্টা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

বামফ্রন্ট সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল পৌরসভার নিজস্ব আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করার যাতে পৌরসভাগুলি সবক্ষেত্রেই রাজ্য সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে না থাকে। কর ভিত্তিক এবং কর বহির্ভূত—এই দুটি ক্ষেত্র থেকে পৌরসভাগুলির আয়ের পথ তৈরি করা হয়। করের ক্ষেত্রে সব থেকে বড় সূত্র ছিল সম্পত্তি কর। এছাড়াও ছিল ট্রেড এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট। কর বহির্ভূত ক্ষেত্রে সব থেকে বড় আয়ের সূত্র হল গৃহ নির্মাণ প্ল্যান অনুমোদন।

অথচ রাজ্যে সরকারের পরিবর্তনের সাথে সাথে পৌরসভাগুলির কার্যক্রমের দৃষ্টিভঙ্গীও পালটে যায়, পৌরসভাগুলি হয়ে উঠেছে দুর্নীতি, গোষ্ঠীকোন্দল, জোর করে বোর্ড দখল, বে-আইনী নির্মাণের কেন্দ্রবিন্দু। এছাড়াও নাগরিক পরিষেবার ক্ষেত্রে দলবাজি, চূড়ান্ত ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হচ্ছে পৌরসভাগুলিতে।

২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার রাজ্যে আসীন হবার পরে সিউড়ি পৌরসভায় পানীয় জলকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি, এস জে ডি এ-তে ২০০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যে পালা বদলের পরে এস জে ডি এ-এর চেয়ারম্যঅন হন শিলিগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক ডাঃ রুদ্রনাথ ভট্টাচার্য। তাঁর আমলেই জোড়াপানি নদী সংস্কার ও পলি পরিষ্কারের কাজে হাত দেওয়া হয়। এই কাজে বহু কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষজ্ঞ দলকে অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে বলা হয়। বিশেষজ্ঞ দলটি তদন্ত করে যে রিপোর্ট জমা দিয়েছে তাতে স্পষ্ট যে আগাগোড়াই দুর্নীতি হয়েছে এই কাজে। সাধারণ মানুষের অভিযোগ এস জে ডি এ যে ২০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে তার সাথে উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও জড়িত। এস জে ডি এ-র সি ই ও গোদালা কিরণকুমারকে এসপি কালিয়াপ্পান জয়রামন দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করায় মুখ্যমন্ত্রী তাকে কম্পালসারি ওয়েটিং-এ পাঠিয়ে দেন। ফলে এই দুর্নীতির অভ্যাস কোথায় দাড়াবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সিউড়িবাসীর জলকষ্টের সুব্যবস্থার জন্য ২০০৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার জল প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছিল।এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের তরফে মোট বরাদ্দ হয়েছে ১৪ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে ১২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই পৌরসভা হাতে পেয়ে গেছে। কিন্তু পৌরসভার পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত মাত্র ৭ কোটি টাকার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। বাকি পাঁচ কোটির কোনো হিসাব নেই। পৌর প্রধান উজ্জ্বল মুখার্জী নির্দ্বিধায় বলে দিয়েছেন যে পৌরসভার প্রয়োজনে অন্য খাতে তা খরচ করা হয়েছে। ৫০ কিমি পাইপ লাইন বসাবার কথা থাকলেও বসেছে মাত্র ১২ কিমি লাইন।

আবার জল প্রকল্পের মতো সমান দুর্নীতি ধরা পড়েছে বস্তি উন্নয়নেও। সিউড়ি পৌরসভায় মোট ৭৩০টি বাড়ি নির্মাণের জন্য মোট ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হলেও মাত্র ২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা খরচের হিসেব দিয়েছে পৌরবোর্ড। নির্মাণ হয়েছে মাত্র ১৩৮টি বাড়ি। বিরোধীরা নন, এই অভিযোগ করেছেন খোদ শাসক দলের বিধায়ক স্বপনকান্তি ঘোষ।

আবার জলপাইগুড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান মোহন বোসের বিরুদ্ধে ৭ কোটি টাকা তছরূপের অভিযোগ ওঠে। তাও আবার ছোট স্কুল পড়ুয়াদের মিড ডে মিলের টাকা তছরূপের অভিযোগ, একে কেন্দ্র করে দাবি ওঠে তদন্ত কমিশনের। ফলে গত ৩০ জুন অভিযুক্ত চেয়ারম্যান ৮ জনকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দান করেন। ফলে আর তদন্ত কমিশনই গঠিত হয়নি।

আবার তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত ডানকুনি পৌরসভার বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতি, স্বজন পোষণের অভিযোগ মানুষের মুখে মুখে, ট্রেড লাইসেন্সে ডোনেশন প্রথা, প্রোমোটারদের বাড়তি সুবিধা দেওয়া, বাড়ির প্ল্যান পাশ করাতে ডোনেশন—এরকম হাজারও অভিযোগ পৌরসভার বিরুদ্ধে।

এই হাজার ধরনের দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠী কোন্দলের আখড়া হয়ে উঠেছে পৌরসভাগুলি। এ বছরের জানুয়ারিতে মেমারি থানায় এক ব্যবসায়ী লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যে ৮নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ১ লাখ টাকা দাবি করার পর তিনি তা দিতে অপারগ বলায় তাকে ঐ কাউন্সিলর খুনের হুমকি দেয়। আবার সেই কাউন্সিলর জানান যে যেহেতু তিনি পৌরসভার চেয়ারম্যানের বেআইনি ঘর তৈরি করে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করার ব্যাপারে বাধা দিয়েছেন তাই তাকে ফাঁসানো হচ্ছে।

আর এর সঙ্গে চলছে পৌরসভাগুলিকে জোর করে দখল করা। হলদিয়া থেকে হালিশহর পর্যন্ত বামপন্থী পৌরবৌর্ডগুলিকে জোর করে ভয় দেখিয়ে দখল করা হচ্ছে যাতে সেখান থেকে নতুন নতুন আয়ের উৎস খুলে যায়, কাউন্সিলরদের ব্যক্তিগত শ্রীবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়, তার জন্য ২০০৪ সালের ৪ জানুয়ারি স্বাধীনতা সংগ্রামী ও কামারহাটি পৌরসভার কাউন্সিলর কমলা দাসের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যখন বামপন্থী কাউন্সিলররা কমলা দাসের শেষকৃত্যের বন্দোবস্তে ব্যস্ত তখন অতিরিক্ত জেলা শাসকের নির্দেশে পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার দিয়ে সভা ডাকিয়ে কামারহাটি পৌরবোর্ড দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস, বোর্ড দখলের পর এই পৌরসভায় সব থেকে উল্লেখযোগ্য যে কাজটি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস তা হল দক্ষিণেশ্বরের একটি পিকনিক স্পট থেকে প্রচুর টাকার গাছ কেটে বিক্রি করে দেওয়া। এই চুরিকে কেন্দ্র করে চার কাউন্সিলরের একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল, তবে তার রিপোর্ট নাগরিকদের জানা নেই। বামপন্থী কাউন্সিলররা বেলঘরিয়া থানায় গাছ চুরির অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

আবার এগরা পৌরসভায় ১নং ওয়ার্ডে পূর্ত দপ্তরের জায়গায় সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে বহুতল মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করে মুখ পুড়েছে পৌরসভার। প্রশাসন এখন সেই নির্মাণ ভাঙছে, এক্ষেত্রেও লক্ষ লক্ষ টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। পরিস্থিতি এমনই ঘোরালো হয়েছে যে তৃণমূলেরই একটি গোষ্ঠী পৌর চেয়ারম্যান তৃণমূলের স্বপন নায়কের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করছে। জল প্রকল্পের টাকা আত্মসাতে, বেআইনি নিয়োগ ইত্যাদির অভিযোগ উঠছে তার বিরুদ্ধে।

বামফ্রন্ট সরকার আর্থ সামাজিক মানোন্নয়নের হাতিয়ার করতে চেয়েছিল পৌরসভাকে, তাই ২০১০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রিসভা গ্রামের মতো শহরের খাস জমিতে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে ১ টাকার বিনিময়ে ৯৯ বছরের লিজে ২ কাঠা করে বাস্তুজমি পাট্টা দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। এর পরেই তুফানগঞ্জ পৌরসভা বিভিন্ন ওয়ার্ডে ১৯০ জনকে জমির পাট্টা দেবার সিদ্ধান্ত নেয়, এর মধ্যে ১৫০ জনের কাগজ তৈরি হয়ে যাওয়ায় তারা পাট্টা পান, আর বাকি ৪০ জনের কাগজ তৈরি না হওয়ায় তাদের সে সময়ে পাট্টা দেওয়া হয়নি। কিন্তু ১ বছরের মধ্যে সরকার পরিবর্তনের ফলে ঐ ৪০টি পরিবার আর পাট্টা পায়নি। সরকারী লাল সুতোয় ঝুলছে এদের ভাগ্য।

আই এইচ এস বি পি স্কিমে বাড়ির জন্য সরকার যেমন এক লক্ষ টাকা দেয় তেমনই বেনেফিসিয়ারীকেও ১৬ হাজার টাকা দিতে হয়, তৃণমূল কংগ্রেস কালনা পৌরসভার নির্বাচনের সময় মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যে ঐ ১৬ হাজার টাকা ফেরত দেবে। কিন্তু পরবর্তীকালে সেখানকার নাগরিকরা দেখেছেন পুরোটাই ধাপ্পা।

আসলে ৭৪তম সংশোধনীর পর পৌরসভাগুলির হাতে বহু কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আসা শুরু হয়। কলকাতা ও আসানসোলের মতো অঞ্চলের জন্য ৮০০ কোটি টাকা পাবে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শহরগুলির জন্য ১ হাজার কোটি টাকা করে প্রকল্প তৈরি হচ্ছে। এগুলোকে হস্তগত করবার জন্যই বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ডগুলিতে এইরকম দুর্নীতির রমরমা এবং পরিষদের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। তাই নাগরিকদের সচেতন ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।□

প্রণব কর, দেবাশিস রায়

প্রসঙ্গ ঃ বিদ্যুৎ (সংশোধনী) বিল ২০১৪

গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৪, সংসদে পেশ হয়েছে বিদ্যুৎ (সংশোধনী) বিল ২০১৪। এই বিল আইনে পরিণত হলে আধুনিক সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ 'বিদ্যুৎ' আরও বেশি মহার্ঘ হয়ে উঠবে এবং জনজীবনে বিভিন্নভাবে তার বিরূপ প্রভাব পড়তে বাধ্য। আমাদের দেশে জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ এখনও বিদ্যুতের নাগাল পায়নি। এই বিল বিদ্যুৎ গ্রাহক ও ব্যবহারকারীর সংখ্যাকে আরও সঙ্কুচিত করবে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের মতোই বিদ্যুৎ শিল্পের বেসরকারীকরণও দেশের শাসকশ্রেণীর লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণে কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ ও বিজেপি পরিচালিত এনডিএ-র অবস্থান একই জায়গায়।

বিদ্যুৎ শিল্পের বেসরকারীকরণের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ২০০৩ সালে। ঐ সময় কংগ্রেস ও বিজেপির যৌথ উদ্যোগে 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' সংসদে গৃহীত হয়। এই আইনের মূল লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছিল—'উৎপাদন, সংবহন ও বণ্টন ক্ষেত্রে বেসরকারী অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা এবং নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব থেকে সরকারের দূরত্ব তৈরি করা।' অর্থাৎ এই আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বেসরকারী পুঁজির অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া। দেশী-বিদেশী বেশ কিছু বেসরকারী কোম্পানি এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় পুঁজির সংস্থানের জন্য তারা ব্যবহার করেছিল সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঋণ পরিশোধ না করে এই ব্যবসা থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছিল।

এখন ঐ ২০০৩-এর আইনকেই সংশোধন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই সংশোধনীর মূল বিষয় হল—বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থাকে বিভক্ত করে বণ্টন ও সরবরাহ ব্যবসায় পরিণত করা।

কিন্তু এই সংশোধনী কার্যকরী হলে সরবরাহকারী সংস্থা বৃহৎ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সরবরাহ করতে উৎসাহিত হবে। ফলে ছোট গ্রাহকদের পারস্পরিক ভর্তুকি উঠে যাবার ফলে বেশি দাম দিতে হবে। তাছাড়া বণ্টন সংস্থা ও সরবরাহ সংস্থার মধ্যে ব্যবসায়িক লেনদেনের সমস্যা তৈরি হলে ক্ষতি হবে গ্রাহকদেরই।

আমাদের দেশে বিপুল অংশে বিদ্যুতের ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু বেসরকারী বিদ্যুৎ উৎপাদকরা অলাভজনক মূল্য কাঠামোর দোহাই দিয়ে ৫০,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্ল্যান্ট বন্ধ রেখেছে। যে সম্পদ তারা ব্যবহার করছে তা এ দেশের। অথচ নিজেদের মুনাফাকে সুনিশ্চিত করতে এরা দেশের মানুষকেই বঞ্চিত করছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি খোলা চোখে বোঝা না গেলেও বিপদসীমার কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারণ রাজ্যে শিল্প পরিস্থিতি অত্যন্ত করুণ। বড় শিল্প হচ্ছে না, যা ছিল তাও ধীরে ধীরে বন্ধ হচ্ছে। ফলে বড় শিল্প গ্রাহকদের কাছ থেকে আয় কমছে, চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে। সরকারী বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলি বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এইভাবে চললে অদূর ভবিষ্যতে চালু প্ল্যান্টগুলিও বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি ক্রমশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। এখনই পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের দাম সব থেকে বেশী। বর্তমান সরকারের আমলে গত ৪ বছরে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে ৫ বার। যা স্বাধীনোত্তর ভারতে রেকর্ড।□

মহিলা কর্মচারীর সম্মানহানির বিরুদ্ধে সরব রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার শ্রমদপ্তরে কর্মরত এক অস্থায়ী মহিলা কর্মচারীর শ্লীলতাহানি করেন ঐ দপ্তরের লেবার কমিশনার সুব্রত রায়। গত ২৪ মার্চ লেবার কমিশনার ঐ মহিলা কর্মচারীকে রান্না করাবার অছিলায় দুপুরবেলা বাড়িতে ডেকে নিয়ে যান এবং সেখানেই তাঁর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন। এমনকি পরের দিন বিষয়টি জানাজানি হলে মহিলা কর্মচারীটিকে চাকরি খোয়াতে হবে বলে হুমকি ও মানসিক নির্যাতন চলতে থাকে। এর বিরুদ্ধে ২৭ মার্চ মহিলা কর্মচারীটি বসিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ করেন এবং সেই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ সুব্রত রায়কে গ্রেপ্তার করে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বসিরহাট মহকুমা শাখার পক্ষ থেকে লেবার কমিশনের ন্যক্কারজনক আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে শ্রম দপ্তরের সামনে

বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়, এবং দোষী ব্যক্তির শাস্তির দাবি জানানো হয়। মূলত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির চাপেই পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। □

রাজ্য কাউন্সিল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নিশ্চিতভাবে গড়ে উঠবেই এবং সেদিন খুব দূরেও নয়।

বিগত কর্মসূচী পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই পরিস্থিতির মধ্যেও ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য সংগঠনের কর্মীরা কাজ করে যাচ্ছেন। সংগঠন চাপের মুখে পিছিয়ে আসেনি। সংগঠনের পক্ষ থেকে কর্মচারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একের পর এক চিঠি দেওয়া হচ্ছে। ১৪ নভেম্বর, ২০১৪ রাজ্যে শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষকদের ১৫টি সংগঠনের আহ্বানে ৪৯ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন সহ ৬ দফা জরুরি দাবিতে মৌলালী যুবকেন্দ্রে কনভেনশন ব্যাপকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ৮-১০টি পথসভা করা হয়েছে যেখানে সংগঠনগুলি অংশগ্রহণ করেছে। ১১-১৫ ডিসেম্বর, ২০১৪ ব্যাপী ১৪টি সংগঠনের আহ্বানে ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে লাগাতার ধরনার কর্মসূচী পশ্চিমবঙ্গের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নতুন নজির সৃষ্টি

রাজ্য কাউন্সিল সভার একাংশ

করেছে। গণঅবস্থানে দ্বিতীয় দিনে ১২ ডিসেম্বর, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্রের উপস্থিতি অবস্থানকারীদের উৎসাহ জুগিয়েছে। ১৫ ডিসেম্বর ছুটির পর শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষকদের বিশাল জমায়েত অনুষ্ঠিত হয় এবং সূর্যকান্ত মিশ্র উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। তিনি ঐ অভূতপূর্ব গণঅবস্থানের কর্মসূচীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বর্তমান স্বৈরাচারী রাজ্য সরকারের কাছ থেকে দাবি আদায় করতে হলে আরও বৃহত্তর কর্মসূচীর দিকে যেতে হবে। তাই তিনি লাগাতার গণঅবস্থান তুলে নেওয়ার অনুরোধ করেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে দাবি দিবস উপলক্ষে ৫ দফা দাবিসনদ এবং রাজ্যের ১৪টি সংগঠনের আহ্বানে ৬ দফা দাবিতে বিকেল ৪টায় ধর্মতলা থেকে হাজরা পার্ক পর্যন্ত 'কেন্দ্রীয় মহামিছিল' কর্মী-কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা তৈরি করে এবং ব্যাপক অংশের মধ্যে এর প্রভাব পড়ে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে ১৭ মার্চ কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মচারীভবনে ''উদারীকরণ, শ্রম আইন সংশোধন, মৌলবাদের বিরুদ্ধে নারীদের সংগ্রাম' শীর্ষক আলোচনাসভা এবং তার পূর্বে রানাঘাটের ধর্ষণের ঘটনায় বিচারের দাবিতে ও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে একটি মৌনমিছিলে অংশগ্রহণ করেন মহিলা কর্মচারীরা। আলোচনা সভায় বক্তা ছিলেন গণতান্ত্রিক মহিলা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী রেখা গোস্বামী।

এরপর তিনি আগামীদিনের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কর্মসূচী এবং তা রূপায়ণের পরিকল্পনার উল্লেখ করেন।

আগামী কর্মসূচী ঃ

(ক) বিগত বিভিন্নমুখিন কর্মসূচীগুলির সাফল্যকে সংহত করে, আগামীদিনে সর্বস্তরের সাংগঠনিক কাঠামোগুলিকে আরো পরিস্থিতি উপযোগী করে তুলে, বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় কর্মী কর্মচারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতি সর্বত্র গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে সংগঠনকে সার্বিকভাবে প্রস্তুত রাখতে হবে।

(খ) এপ্রিল-মে, ২০১৫ মাস জুড়ে সমিতি, জেলা ও অঞ্চলগুলিতে রক্তদান ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর উদ্যোগ নিতে হবে।

(গ) ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে মে-দিবসের কর্মসূচী প্রতি বছরের ন্যায় কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মচারী ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। তাতে জমায়েতের উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়া জেলা, অঞ্চল, সমিতিগুলি অতীতের ন্যায় উক্ত কর্মসূচী উপযুক্ত মর্যাদায় পালন করবে।

(ঘ) সমিতিগুলিকে নিজস্ব দাবি-দাওয়া নিয়ে কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। ইতোমধ্যে কয়েকটি সমিতির কর্মসূচী সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সফর অনুষ্ঠিত হবে আগামী মে, ২০১৫ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। জেলার সকল ব্লকে কর্মচারী জমায়েত করে সাধারণ সভা সংগঠিত করা হবে এবং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সাথে বৈঠক করা হবে।

দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত ঃ গত ১১ মার্চ, ২০১৫ ৪৯ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘভাতা, ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন সহ চুক্তি প্রথায় ও অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করার দাবিতে জরুরি ভিত্তিতে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

ক্যাশলেস হেলথ স্কীমের (২০১৪) ব্যাপক অসংগতিগুলি অবিলম্বে দূর করে প্রকৃত অর্থে ক্যাশলেস হেল্‌থ স্কীমের সুযোগ চালু করার এবং হেলথ্‌ স্কীম ২০০৮-এ প্রাপ্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা বজায় রাখার দাবি জানিয়ে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

সাংগঠনিক করণীয় বিষয়ঃ

(১) সদস্যভুক্তির কর্মসূচীতে দপ্তরে দপ্তরে সব কর্মচারীদের কাছে পৌঁছাতে হবে এবং জুন, ২০১৫ মাসের মধ্যে সদস্য সংগ্রহ অভিযান গুটিয়ে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টসহ সব সমিতি, জেলা, অঞ্চলকে সাংগঠনিক ত্রৈমাসিক রিপোর্ট কেন্দ্রীয়ভাবে জমা দিতে হবে।

(২) সংগ্রামী হাতিয়ার এবং এমপ্লয়িজ ফোরামের গ্রাহকভুক্তির কাজ সমাপ্ত করে এপ্রিল, ২০১৫ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) জেলা, অঞ্চল ও সমিতির নেতৃত্বকে সকল সমিতিগুলির সাংগঠনিক পরিস্থিতি অনুযায়ী পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়েই ঐক্যবদ্ধভাবে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে সর্বত্র সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পত্র-পত্রিকার গ্রাহকভুক্তি, বৃদ্ধি করার উদ্যোগসহ দৈনন্দিন কাজ ও কর্মসূচীতে কর্মচারীদের উপস্থিতি আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিরামহীন প্রয়াস জারি রাখতে হবে।

(৪) জম্মু ও কাশ্মীর ত্রাণ তহবিলের কুপন সহ বকেয়া অর্থ অবিলম্বে কেন্দ্রীয়ভাবে জমা দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।

(৫) রাজ্য কাউন্সিল-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্কীম/প্রোজেক্ট ভিত্তিতে নিযুক্ত বিভাগ ভিত্তিক কর্মীদের সংখ্যাতথ্য অবিলম্বে গুটিয়ে এনে কেন্দ্রীয় দপ্তরে অবিলম্বে প্রেরণ করতে হবে।

(৬) **সংগঠন তহবিল, ২০১৫ ঃ** জুন-জুলাই, ২০১৫ মাসের বেতন থেকে সংগঠন তহবিল সংগৃহীত হবে। (মোট বেতন ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত ১০০ টাকা, ২০,০০১ টাকা থেকে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত ১৫০ টাকা এবং ৩০,০০১ টাকার ঊর্ধ্বে ২০০ টাকা)।

আন্দোলনগত ঃ

(ক) ৪২ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন করা সহ চুক্তি প্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে নিয়মিত কর্মচারীদের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দাবিতে আগামীতে কর্মচারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে বৃহত্তর সংগ্রামের ব্যাপক প্রস্তুতি সর্বত্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

(খ) আগামী জুন, ২০১৫ মাসের প্রথমার্ধে জরুরি দাবিগুলিকে নিয়ে জেলায় মহকুমাস্তরে বড় বড় জমায়েতের কর্মসূচী নিতে হবে। ব্যাপক কর্মচারী জমায়েত সুনিশ্চিত করতে সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

প্রারম্ভিক বক্তব্যের ওপর জেলা ও অঞ্চল থেকে মোট ২৫ জন বক্তব্য রাখেন। আলোচনার শেষে জবাবি বক্তব্যে যুগ্ম সম্পাদক বলেন, পরিস্থিতি ভেদ করতে গেলে যে প্রধানভিত্তির উপর দাঁড়াতে হবে তা হল সদস্য সংগ্রহ অভিযান। যৌথ উদ্যোগে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এই কাজে নামতে হবে। তিনি বলেন, বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের জন্য আন্দোলনের কর্মসূচী নিতে হবে। রাইটার্স বিল্ডিং-এ সংগঠন দপ্তর ভাঙার নির্দেশকে কেন্দ্র করে আইনি লড়াই-এর পথে কৌশলগতভাবে সংগঠনকে যেতে হয়েছে এবং আদালতের রায় সংগঠনের পক্ষে হয়েছে। এটা উল্লেখযোগ্য জয়। রাইটার্স বিল্ডিং লাইব্রেরীকে ভাঙার তৎপরতা শুরু হয়েছে। ইতিহাসে সব স্বৈরাচারী শাসকদেরই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে বই, গ্রন্থাগার, একথা স্মরণ করিয়ে দেন তিনি।

তিনি বলেন, আমরা বিগত সময়ে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী প্রতিপালন করেছি। কিন্তু কর্মসূচী নিজে কোনো লক্ষ্য নয় একথা মনে রাখতে হবে। কর্মসূচীর সাফল্য খুঁজতে হবে কর্মসূচী সংগঠনে কোনো নতুন উপাদান যোগ করতে পারল কিনা, নতুন কর্মীদের তুলে আনতে পারল কিনা তার মধ্যে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, মুখপত্রের বিষয়বস্তু আধুনিক হতে হবে।

বদলি, এবং বিভিন্ন কারণে কর্মীদের অনুপস্থিতি সাংগঠনিক কাজ পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে বহুক্ষেত্রে। সংগঠনের কাজ পড়ে থাকতে পারে না, প্রয়োজনে দায়িত্ব পুনর্বন্টন করার প্রস্তাব জেলা/অঞ্চল থেকে পাঠালে তা বিবেচনা করা হবে। পরিবর্তনশীল জগতে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী নেতা-কর্মী-সংগঠকদের নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন ঘটাতে হবে। সাধারণ সম্পাদকের উত্থাপিত প্রস্তাব সম্পাদকদের জবাবীর মধ্য দিয়ে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।□

শাশ্বতী মজুমদার
অশোক রায়

হাতে থাক সংগ্রামী হাতিয়ার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পাচ্ছে। একের পর এক ধর্ষণ ও হত্যা সংগঠিত হচ্ছে মহিলাদের উপর। বয়সের কোন সীমারেখা নেই — আক্রান্ত হচ্ছে তিন বছর থেকে সত্তর বছর, সব বয়সের মহিলারাই। কোন বিচার পাওয়া যাচ্ছে না বরং আক্রমণকারীরা বুক ফুলিয়ে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং অভিযোগ তুলে নিতে বাধ্য করে বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে। তৃণমূল দলের দ্বারা রাজ্য সরকার পরিচালিত হওয়ার মধ্য দিয়ে নৈরাজ্য, দুর্নীতি, চিটফান্ড সহ বিভিন্ন প্রকার কেলেঙ্কারি সামনে এসে পড়ছে প্রতিদিন। একই সঙ্গে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা আর্থিক ও অন্যান্য সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে চলেছে। কর্মচারীদের প্রিয় সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও তার কর্মী নেতৃবৃন্দের উপর ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। কর্মীদের মহার্ঘভাতা সহ অন্যান্য ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য লাগাতার দিন রাত্রি অবস্থান সহ নানাবিধ আন্দোলন সংগঠিত করতে হচ্ছে। এই রকম কঠিন সময়ে নানা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি থেকে কর্মচারীদের মুক্ত করার কঠিন কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে চলেছে আমাদের প্রিয় মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার। শুধু তাই নয়, প্রকৃত ভাবেই জনগণের সংগ্রামের সাথে কর্মচারী আন্দোলনকে সংযুক্ত করার ভাবনাকে প্রসারিত করার কঠিন কাজটিও ৪৪ বছর ধরে আপসহীন ভাবে করে চলেছে এই পত্রিকা। এ পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যাই তার সাক্ষ্য বহন করছে। এই কারণেই কর্মচারীদের কাছে সংগঠনের মতই প্রিয় এই পত্রিকা।

সংগঠনকে যেমন প্রতিকূল সময়ের কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে, ঠিক সেই ভাবেই সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকাকে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে। সংগ্রামী হাতিয়ার সেই ধারাবাহিক প্রচেষ্টা বজায় রেখেছে, যাতে কর্মচারী সমাজ শুধু দাবিদাওয়ার আন্দোলনে নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে — ফলাফলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেয়ে, তার কারণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শামিল হয়। সংগঠনের নেতা, কর্মী, তথা সমগ্র কর্মচারী সমাজকে পরিস্থিতি সচেতন করার কাজ ধারাবাহিক ভাবে করে চলেছে সংগ্রামী হাতিয়ার।

যে প্রতিকূল পরিস্থিতি বর্তমান নতুন সরকারের আমলে সৃষ্টি হয়েছে, সেই অভিজ্ঞতা পত্রিকা পরিচালনার কাজে যুক্ত কর্মী নেতৃত্বের ছিল না। এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা — এই ধরনের আক্রমণ ভাবনার অতীত ছিল। বর্তমানে যারা জেলায় জেলায় এই পত্রিকা গ্রাহককুলের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন তারা অনেক বাধা ও প্রতিকূলতাকে জয় করে সাহসের সাথে সেই কাজটি করছেন। তাদের সেই প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। পরিস্থিতি বলছে আক্রমণ আরো বৃদ্ধি পাবে। শাসক শ্রেণী শ্রমজীবী মানুষের চেতনা বৃদ্ধিকে ভয় করে, তাই আক্রমণ সে শাণাবে এবং তা ক্রমশ তীব্র হবে। চেতনা বৃদ্ধির হাতিয়ার মুখপত্রকে সকলের কাছে নিয়ে যেতে হবে। গত বছরের তুলনায় গ্রাহক বৃদ্ধির এই চ্যালেঞ্জকে আরও তীব্র করে সমস্ত আক্রমণের উচিত জবাব দিতে সর্বস্তরের কর্মী নেতৃত্ব সংগ্রামী হাতিয়ারের গ্রাহক ভুক্তিকে সাফল্যের শীর্ষে তুলে ধরুন, এই হোক আমাদের অঙ্গীকার। □

সুগত দাস

রেলবাজেট

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

মাটির জনগণের কথা একটু ভাবুন। রেলমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যতই দুরবস্থা হোক এখনও রেলই একমাত্র সংস্থা যেখানে তার কর্মচারীদের বেতন, পেনশন এবং রেলব্যবস্থা পরিচালনার সমস্ত ব্যয় তার নিজস্ব রাজস্ব থেকেই করা সম্ভব হচ্ছে। প্রভু যেটা কখনই স্বীকার করবেন না, কর্পোরেটদের মুখের দিকে তাকিয়ে একের পর এক সিদ্ধান্ত না নিলে একসময়ের সর্বাধিক লাভজনক কেন্দ্রীয় সংস্থা এভাবে শুকিয়ে যেত না। প্রভু বলেছেন, রেল হল ভারতীয় জনজীবনের 'লাইফলাইন'। আমরা বলছি সেই লাইফলাইনকে মানুষের স্বার্থে কাজে লাগানো দরকার। শিল্পবান্ধব না হয়ে মানুষের বন্ধু হয়ে উঠুক ভারতীয় রেল।

২০১৫-১৬ বর্ষের রেল বাজেটের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- রেলের ট্র্যাকের ক্ষমতা বাড়ানো হবে।
- ১৭ হাজার শৌচাগারকে জৈব-শৌচাগারে পরিণত করা হবে।
- রেলওয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং বেসরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের পথে যাবে।
- সারা দেশে ৭দিন ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন নং '১৩৮' চালু করছে রেল।
- মোবাইল অ্যাপের সাহায্যে অভিযোগ জানানো যাবে।
- ট্রেন ছাড়া ও পৌঁছনোর খবর এস এম এস-এ দেওয়া হবে।
- ৫ মিনিটের মধ্যে সংরক্ষিত টিকিট পাওয়া যাবে।
- চারমাস আগে ট্রেনের টিকিট সংরক্ষণ করা যাবে।
- ১০৮টি ট্রেনে চালু হবে ই-ক্যাটারিং।
- বড় বড় শহরগুলিতে গড়ে উঠবে স্যাটেলাইট রেলওয়ে টার্মিনাল।
- আই আর টি সি প্রতিবন্ধী, রোগী ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে উন্নত সুযোগসুবিধার বন্দোবস্ত করবে।
- ৪০০টি স্টেশনে ওয়াই-ফাই-এর সুযোগ থাকবে।
- মহিলা কামরা ও অন্যান্য কিছু কামরাতেও নজরদারি ক্যামেরার ব্যবস্থা হবে।
- পরিষেবা গ্রাহকদের জন্য নতুন ওয়েবসাইট ডিজিটাল ইন্ডিয়ার উদ্যোগকে সাহায্য করবে এই উদ্যোগ ।
- ৭৭টি প্রকল্প শুরু হবে যাতে বিভিন্ন রেলপথে লাইনের সংখ্যা বাড়ানো এবং বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ হবে। রেলপথে মোট বৈদ্যুতিকীকরণ ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।
- উচ্চ গতিসম্পন্ন ট্রেনের জন্য ৯টি করিডোর তৈরি হবে। এই করিডোর গুলিতে ট্রেন চলবে ঘণ্টায় ১৬০-২০০ কি.মি. গতিতে।
- ট্রেনে অগ্নি নির্বাপনের সতর্কতামূলক প্রযুক্তি এবং চলন্ত ট্রেনের সংঘর্ষ এড়ানোর প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে।
- রেলপথের পরিকল্পিত বৃদ্ধি হবে ৫২ শতাংশ।
- রেলের জমির ডিজিটাল ম্যাপ তৈরি হবে রেলের জমি দখল রোধের জন্য। □

নারী দিবস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মৌলালী হয়ে আবার কর্মচারী ভবন পর্যন্ত।

মেছিলের পরে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আলোচনা সভা শুরু হয়। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় মহিলা উপসমিতির অন্যতম আহ্বায়িকা শিখা মুখার্জী। তারপর বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী এবং সভার প্রধান বক্তা রেখা গোস্বামী। আলোচনার শুরুতে শ্রীমতি গোস্বামী নারী মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস উল্লেখ প্রসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক নারী আন্দোলনের কথা এবং সোভিয়েতে নারীদের সমস্যা সমাধানে কীভাবে রাষ্ট্র উদ্যোগী হয়েছিল তা উল্লেখ করেন। তিনি এ বিষয়ে তাঁর নিজের চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতারও উল্লেখ করেন।

কর্পোরেট দুনিয়ায় তীব্র শোষণের উল্লেখ করে তিনি বলেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না, কোনো সার্ভিস রুল নেই। আজকের প্রজন্মের যারা কর্পোরেট সেক্টরে কাজ করছে তাদের নানা কায়দায় যেভাবে মোহগ্রস্ত করা হচ্ছে, তাতে শোষণ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা তৈরি হচ্ছে না। এক সমাজ-বিচ্ছিন্ন ভোগবাদী জীবনের স্বপ্ন তাদের সামনে হাজির করা হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন ঘটনায় প্রতিবাদী আন্দোলনে নতুন প্রজন্ম শামিল হয়েছে কিন্তু তারা ট্রেড ইউনিয়ন করতে আসছে না, তারা বাঁধাধরা নিয়মে থাকতে চাইছে না।

তিনি বলেন, ভারতীয় সংবিধানের ধর্ম নিরপেক্ষতার মর্মবস্তুকে অস্বীকার করছে সাম্প্রদায়িক শক্তি। এরা বহুত্ববাদ মানে না। সবচেয়ে ভয়ের বিষয় আর এস এস ঠিক করে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরা কি কাজ করবেন বা করবেন না। শিক্ষা ও সংস্কৃতি তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে। নাথুরাম গডসের মূর্তি তৈরি করে তাকে জননেতা বানানো হয়েছে। আমাদের দেশের মেয়েদের ঐতিহ্য নাকি ঘরের অভ্যন্তরে থাকা। ধর্মীয় উন্মত্ততা সমস্ত সমাজকে গ্রাস করছে। পশ্চাদ্‌পদ ধারণাকে ধর্মের মোড়কে সামনে আনা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গেও মেরুকরণের রাজনীতি চালাচ্ছে এখানকার স্বৈরাচারী শাসক। এই পরিস্থিতি চলতে পারে না, এই পরিস্থিতি পাল্টাতে সবার সমবেতভাবে প্রতিরোধে এগিয়ে আসার প্রয়োজন, তবেই আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন সার্থকতা লাভ করবে। এই সভা পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় মহিলা উপসমিতির অন্যতম প্রবীণ সদস্যা বানী মুখার্জী। □ *শাশ্বতী মজুমদার*

সমিতি সম্মেলন ● সমিতি সম্মেলন ● সমিতি সম্মেলন

ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট এগ্রিকালচার অ্যান্ড হর্টিকালচার সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশন-এর ৪৬ তম রাজ্য সম্মেলন বিগত ২৩, ২৪ জানুয়ারি '১৫ জলপাইগুড়িতে জেলা পরিষদ হলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন শুরুর আগের দিন মশাল মিছিল এবং সম্মেলন শুরুর প্রাক্কালে বিশাল মিছিল জলপাইগুড়ি শহর পরিক্রমা করে সম্মেলন প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। এরপর রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান কর্মসূচীর পর সম্মেলনের মূল কাজ শুরু হয়। সম্মেলন পরিচালনা করেন পাবর্তী চরণ দাস, জগৎ জ্যোতি বর্মা এবং রঙ্গলাল মাহাতোকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সম্মেলন উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আশীষ ভট্টচার্য। সম্মেলন উপলক্ষে একটি প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন জেলার প্রবীণ নেতা তপন মৈত্র। প্রায় ১৫ হাজার টাকা মূল্যের পুস্তক এই কেন্দ্র থেকে বিক্রয় হয়। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য।

সম্মেলনে প্রতিবেদন উত্থাপন করেন যুগ্ম-সম্পাদক প্রদীপ সামন্ত। আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ চন্দন সরকার। এর উপর আলোচনা করেন ১ জন মহিলা সহ মোট ২৫ জন। সমগ্র আলোচনার উপর জবাবী বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক কালোবরণ পট্টনায়ক। সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ২ জন মহিলা সহ মোট ১৭৯ জন।

দুদিনব্যাপী এই সম্মেলন থেকে আগামী দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত পদাধিকারীরা হলেন।

সভাপতি ঃ জগৎ জ্যোতি বর্মা, সাধারণ সম্পাদক ঃ কালোবরণ পট্টনায়ক, যুগ্ম-সম্পাদক ঃ নির্মল দেবনাথ ও প্রদীপ সামন্ত, কোষাধ্যক্ষ ঃ চন্দন সরকার, মুখপত্র আহ্বায়ক ঃ প্রকাশ হালদার। □

বিগত ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি আনাউন্সাহ মঞ্চের (সুকুমার চ্যাটার্জী মঞ্চ) ও মানিক চৌধুরী নগরে মিছিল সহকারে শহর পরিক্রমার পর রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে রক্তদানের মধ্য দিয়ে **ওয়েস্ট বেঙ্গল জেলা পরিষদ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের** ত্রয়োদশ রাজ্য সম্মেলনের সূচনা হয়। সম্মেলনের শুরুতেই স্বাগত ভাষণ দেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি সুবীর রায়। মহতী এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দপ্তর সম্পাদক গোপাল পাঠক। তিনি বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাখ্যাসহ এই সময়ে কর্মচারী আন্দোলনের সামনে করণীয় সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি অসীম গোস্বামী, বিশেষ অতিথি জ্যোতি প্রসাদ বসু। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব ও খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন যথাক্রমে গুণময় মুখার্জী, এহসানুল হক, দিলীপ দত্ত, নজরুল ইসলাম ও কল্যাণ চক্রবর্তী। ২০ জন প্রতিনিধির আলোচনার পর জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ রায়। পরে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জেলা ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক রতন ভাস্কর। এছাড়া সম্মেলন মঞ্চে ''সাম্প্রদায়িকতা, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও বৃহত্তর সমাজে তার প্রভাব'' শীর্ষক আলোচনা করেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও অধ্যাপক সুস্নাত দাস। সম্মেলন থেকে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিরোধ, সমস্ত শূন্যপদ পূরণ, সুষ্ঠু বদলী নীতিসহ কর্মচারীদের প্রতি বঞ্চনা বন্ধ করা, বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারসহ অর্জিত অধিকার রক্ষা ইত্যাদি বহুবিধ দাবি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলন থেকে সভাপতি হিসেবে অসিত চক্রবর্তী, সন্দীপ রায়কে সাধারণ সম্পাদক, গুণময় মুখার্জী ও দিলীপ দত্তকে যুগ্ম সম্পাদক, এহসানুল হককে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে ৫২ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক আশীষ আগরওয়ালা উপস্থিত প্রতিনিধিসহ বিশিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সম্মেলন পরিচালনা করেন অভিলাষ চৌধুরী, প্রদীপ দে, অসিত চক্রবর্তী ও দেবল দাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।□

নিরঞ্জন প্রামাণিক (জেলা সংবাদদাতা)

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুরে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা দপ্তরে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে **ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট ইলেকট্রিক্যাল অ্যাণ্ড মেকানিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ২৬তম দ্বিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন।** মিছিল, রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে সূচনা হয় দু'দিন ব্যাপী এই সম্মেলনের।

সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য দেবাশীষ মিত্র। প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে ভাষণ দেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক হর প্রসাদ সমাদ্দার। এছাড়া উদ্বোধনী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক সুযশ চক্রবর্তী।

সম্মেলনে মোট প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন ১৮৯ জন। যুগ্ম-সম্পাদক পুরুষোত্তম যাদবের পেশ করা সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কলকাতার ৭টি অঞ্চল ও ১৬টি জেলার পক্ষে মোট ৩৩ জন প্রতিনিধি। জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক চন্দন সেন রায়। প্রতিবেদন, ১১ দফা দাবি সংবলিত প্রস্তাব ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়েছে। সম্মেলন পরিচালনা করেন দেবাশিষ রায়চৌধুরী, পরিতোষ নন্দী, অশোক ব্যানার্জী ও রাম সিংকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী, সম্মেলনে সমিতির প্রাক্তন নেতৃবৃন্দকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

সম্মেলন থেকে সভাপতি পদে দেবাশিষ রায়চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক পুরুষোত্তম যাদব, যুগ্ম-সম্পাদক অমল বিশ্বাস ও কোষাধ্যক্ষ পদে শিবু ঘোষকে নির্বাচিত করে মোট ৫৮ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি ও ১৯ জনকে নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সম্মেলনের প্রাক্-প্রস্তুতি পর্বে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছিল। □

পরমেশ দে

গত ১৪-১৫ মার্চ, '১৫ মালদা কর্মচারী ভবনে অনুষ্ঠিত হলো **পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কৃষি খামার মজদুর সমিতির** চতুর্দশ রাজ্য সম্মেলন। মিছিল সহকারে মালদা শহর পরিক্রমার পর রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। শুরুতে সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি রতন ভাস্কর স্বাগত ভাষণ রাখেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রদীপ নাগ। সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাবও খসড়া দাবি প্রস্তাব পেশ করেন যথাক্রমে যুগ্ম সম্পাদক নবীন সরকার, কোষাধ্যক্ষ হামিদ মল্লিক ও কার্তিক ছাঁটুই এবং কৃষ্ণ রায়। ১০ জন মহিলা প্রতিনিধিসহ মোট ২৬ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন। জবাবী ভাষণ রাখেন সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণু মজুমদার। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সমিতির প্রাক্তন উপদেষ্টা সুশীল ব্রহ্ম এবং মালদা জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক তথা সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি সুবীর রায়।

সম্মেলন থেকে লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ, বেকারদের স্বার্থে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ, রাজ্য প্রশাসনে সমস্ত শূন্যপদ পূরণ, কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে খামারগুলির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করা, কৃষি খামারের জমি হস্তান্তর না করা, রাজ্যের নৈরাজ্য বন্ধ করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা, মহিলাদের উপর পৈশাচিক আক্রমণ বন্ধ করা, সাম্প্রদায়িকতা ও জাত-পাতের নামে গরীব মানুষের বিভাজন বন্ধ করা ইত্যাদি বহু দাবি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্মেলন থেকে নাজির আহমেদকে সভাপতি, বিষ্ণু মজুমদারকে সাধারণ সম্পাদক, নবীন সরকার ও কার্তিক ছাঁটুইকে যুগ্ম সম্পাদক, হামিদ মল্লিককে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে ২৮ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। পরিশেষে, সম্মেলন সফল হওয়ার জন্য অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক ধনঞ্জয় মণ্ডল সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সম্মেলনে ১৩৩ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন পরিচালনা করেন সুশান্ত ব্যানার্জী, মাদারিয়া মুর্মু ও নাজির আহমেদকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।□

নিরঞ্জন প্রামাণিক (জেলা সংবাদদাতা)

গত ২১-২২ ফ্রেব্রুয়ারি '১৫ **পশ্চিমবঙ্গ গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়ক সমিতির ৪র্থ রাজ্য সম্মেলন** বর্ধমান জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সুবর্ণ জয়ন্তী সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন শুরুর প্রাক্কালে বর্ণাঢ্য মিছিল বর্ধমান শহর পরিক্রমা করে। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি অলোকেশ শর্মা। শহীদ বেদীতে মাল্যদানের পর সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রদীপ নাগ।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক দীপক ভট্টাচার্য, আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ ছামসেদ আলি। আগামী কর্মসূচী ও দাবি সনদ পেশ করেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক দিলীপ সেন। ১৮টি জেলার ১৮ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। জবাবী বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক অশোক রাজ।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে পঞ্চায়েতের উপর আক্রমণ, কর্মচারীদের দমন পীড়ন রোধ সহ রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখার স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন যৌথ কমিটির সাধারণ সম্পাদক শম্ভু সামন্ত। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন যৌথ কমিটির উপদেষ্টা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম প্রবীণ নেতৃত্ব অশোক সেনগুপ্ত।

সম্মেলন মঞ্চ থেকে ৪২ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি, ১৮ জনের সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। সভাপতি ঃ প্রণব রায়, সাধারণ সম্পাদক ঃ অশোক রাজ, যুগ্মসম্পাদক দিলীপ সেন এবং দীপক ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ ঃ মিহির মণ্ডল নির্মাচিত হন। সমগ্র সম্মেলন পরিচালনা করেন অলোকেশ শর্মা, প্রণব রায়, আবুল কালাম আজাদ, গজেন্দ্র বর্মণকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। □

'ক্যাশলেশ হেলথ স্কীম ২০১৪' সম্পর্কিত কর্মশালা

গত ২২ ফেব্রুয়ারি, '১৫ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, মালদা জেলা শাখার উদ্যোগে জেলাসদরের কর্মচারী ভবনে অনুষ্ঠিত হলো ''ক্যাশলেশ হেলথ স্কীম ২০১৪'' সম্পর্কিত কর্মশালা। শুরুতে সংগঠনের উদ্যোগে এ ধরনের কর্মশালা করার প্রসঙ্গিকতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক সুবীর রায়। এরপরে এই কর্মশালার কর্মচারী ও পেনশনারদের অন লাইন রেজিস্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট অব্ এনরোলমেন্ট সম্পর্কিত বিষয়গুলি প্রোজেক্টার মেশিনের মাধ্যমে প্রদর্শন করে কর্মচারীদের অবহিত করেন কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার নেতা ভাস্কর চৌধুরী। এছাড়া রেজিস্ট্রেশন, এনরোলমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরসহ বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি (ডব্লু.বি.এম.ও.এ)-র নেতা দেবাশীষ দাস। এই কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন দপ্তর থেকে শতাধিক কর্মচারী ও পেনশনারগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালা সঞ্চালনা করেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক প্রদীপ বাঘিড়া। সভাপতিত্ব করেন জেলা কো-অর্ডিনেশন সমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নবীন দাস।□

নিরঞ্জন প্রামাণিক (জেলা সংবাদদাতা)

দৃষ্টি আকর্ষণ

সংগ্রামী হাতিয়ার ও এমপ্লয়িজ ফোরামের নতুন গ্রাহকবর্ষের গ্রাহক সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। গত ২১-২২ মার্চ অনুষ্ঠিত রাজ্য কাউন্সিল সভায় এই কাজে গোটা রাজ্যজুড়ে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জেলা ও অঞ্চল কমিটিগুলির কাছে রাখা হয়েছে। অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সমিতিগুলিকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। গ্রাহক সংগ্রহের কাজে যেমন যেমন অগ্রগতি ঘটবে ধাপে ধাপে তা কেন্দ্রীয় দপ্তরে জানানো এবং সংগৃহীত গ্রাহকমূল্য দ্রুত কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। □

জেলা / অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতিপালন

সংগঠনের রাজ্য কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সারা বছর ধরেই বিভিন্ন জেলা/অঞ্চল ও সমিতিগুলির পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতিপালিত হবে। এবারের প্রতিপালনের কেন্দ্রীয় বিষয় উদারীকরণ, শ্রমআইন সংস্কার ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে নারীদের সংগ্রাম।

গত ২৪ মার্চ মঙ্গলবার **রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখার** উদ্যোগে 'উদারীকরণ, শ্রম আইন সংস্কার ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে নারীদের সংগ্রাম শীর্ষক এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় কর্মচারী ভবনে মহিলাদের জমায়েতের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এই সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির মহিলা উপসমিতির পক্ষ থেকে গীতা দে ও পৌষালী সরকার উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক গঙ্গাধর বর্মন, শর্মিলা গুহ, উমা বেরা, প্রমিলা মণ্ডল। তাঁরা রাজ্যের সার্বিক মহিলাদের নিরাপত্তাহীনতার উপর আলোচনা করেন। উপসমিতির সদস্যরা আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। আগামী দিনের কঠিন লড়াইয়ের জন্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উপর জোর দেন। সভা পরিচালনা করেন নিয়তি ব্যানার্জী। □

গত ২০ মার্চ ২০১৫, খাদ্যভবনের অভ্যন্তরে **কলকাতা মধ্য অঞ্চলের সংগঠন দপ্তরে** আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে অঞ্চলের মহিলা কর্মী-সদস্যদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় মূল আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা ছবি ঘাটা হালদার। সভায় উপসভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় মহিলা সমিতির সদস্যা সুচেতা সাহা। ঐ সভায় মোট ৫৪ জন মহিলা কর্মী-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। □

ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট কর্মচারীদের ১০ দফা দাবিতে আন্দোলন কর্মসূচী

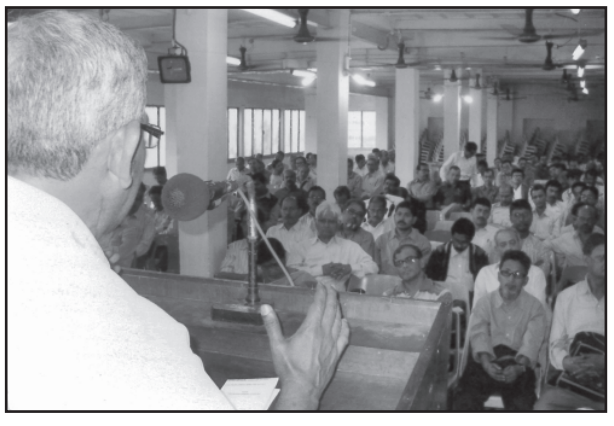

পশ্চিমবঙ্গ ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১৯ ফেব্রুয়ারি '২০১৫ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হলে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা, ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন, পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করা এবং ওয়ার্ক চার্জড কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ সহ ১০ দফা গুরুত্বপূর্ণ দাবিতে আন্দোলন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কর্মসূচীতে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি অশোক গোস্বামী। দাবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক পবন দাস। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী। এই বিক্ষোভ সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ। উত্থাপিত দাবিগুলিকে সমর্থন করে তিনি বলেন, বর্তমানে যে সরকার রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় আসীন তারা মুখে নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও আসলে শ্রমিক কর্মচারী স্বার্থবিরোধী। এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জ্যোতি প্রসাদ বসু। মূলত কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলা সহ অন্যান্য সমস্ত জেলা থেকেই প্রতিনিধিত্বমূলক উপস্থিতির মধ্য দিয়ে সমাবেশে প্রায় দুই শত কর্মচারী বন্ধু উপস্থিত ছিলেন।

আগামী দিনে আরও সংগ্রামের জন্য সংগঠন প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। এই সরকার সমাবেশে উত্থাপিত দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল না হলে আগামী দিনে লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই সরকারের অনিচ্ছুক হাত থেকে দাবি আদায় করব—কর্মচারী সমাজের এই প্রত্যয় ব্যক্ত হয় এই সমাবেশের মধ্য দিয়ে। সমাবেশ থেকে সর্বসম্মতিক্রমে দাবিপ্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। গৃহীত দাবিপ্রস্তাব রাজ্যের অর্থমন্ত্রী, অর্থসচিব ও বিভাগীয় সচিবদের নিকট প্রেরণ করা হবে। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
43rd Year 11th Issue, March 2015

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

পশ্চিমবঙ্গে আলু চাষীদের দুরবস্থা

কলকাতাকে বলে মিছিল নগরী, শুধু কলকাতা কেন এই রাজ্যটাই 'মিছিল রাজ্য' হয়ে যাচ্ছে। অনেক রকম মিছিল আমরা দেখেছি। দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য মিছিল শান্তির পক্ষে মিছিল, খুন-জখম-ধর্ষণ-অন্যায়ের প্রতিবাদে মিছিল, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মিছিল ইত্যাদি। আবার পাশাপাশি এরাজ্যে আরেক ধরনের মিছিলও পরিলক্ষিত হচ্ছে গত প্রায় চার বছরে। যেমন কখনো শিশুমৃত্যু মিছিল আবার কখনো ঋণের দায়ে কৃষক আত্মহত্যার মিছিল। বাঙালীর প্রিয় খাদ্য যেমন মাছ-ভাত, তেমনই অন্যতম আরেকটি হল আলুমাখা-ডাল-ভাত। বিশেষত নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্তদের। কিন্তু এই তৃপ্তিদানকারী আলুই যে এমন আত্মহননের পথে ঠেলে দেবে কৃষকদের শুধুমাত্র প্রশাসনের অসহযোগিতায় এটা বিগত চারবছর আগেও ভাবা যেত না।

সরকারীভাবে ১লা মার্চ থেকে শুরু হয়েছে চলতি বছরের আলু মরসুম। প্রথম থেকেই কৃষকরা সঠিক দাম পাচ্ছেন না। সাধারণত একবিঘা জমিতে আলু চাষ করতে খরচ হয় ২২-২৪ হাজার টাকা (নিজের শ্রম বাদ দিয়ে) এবং কুইন্টাল প্রতি খরচ ৩০০ টাকা, সেখানে কৃষকদের প্রাপ্ত বিক্রয় মূল্য ১২০-১৫০ টাকা মাত্র। এই বিপুল ক্ষতির পরিমাণ কৃষকরা বহন করতে না পেরেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। দেখে নেওয়া যাক্ মৃত্যু মিছিলের তালিকাটির সারণী।

	মৃত্যুর তারিখ	নাম	জেলা
১.	৪/৩/১৫	রথীন মান্না	হুগলী, পুরশুড়া
২.	১০/৩/১৫	গুরু মুর্মু	বর্ধমান, ভাতার
৩.	১০/৩/১৫	স্বপন কুণ্ডু	হুগলী, খানাকুল
৪.	১২/৩/১৫	সঞ্জয় মণ্ডল	বর্ধমান, মঙ্গলকোট
৫.	১৩/৩/১৫	রিক্ত দলুই	পশ্চিম মেদিনীপুর, কেশপুর
৬.	১৪/৩/১৫	কৃষ্ণ সর্দার	বর্ধমান, কালনা
৭.	১৫/৩/১৫	তপন জানা	হুগলী, আরামবাগ
৮.	১৬/৩/১৫	সঞ্জয় কুঁকড়ি	হুগলী, তারকেশ্বর
৯.	১৭/৩/১৫	মঙ্গলা রায়	বাঁকুড়া, কোতলপুর
১০.	১৭/৩/১৫	গণেশ সোরেন	বর্ধমান, গলসী
১১.	২১/৩/১৫	অতুল লেট	বর্ধমান, চকদীঘি
১২.	২১/৩/১৫	বিজয় হাঁসদা	বর্ধমান, কালনা শিবরামপুর।

প্রশাসনের ভূমিকা এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রথামত ও স্বভাবগতভাবেই এই সমস্ত আত্মহত্যার ঘটনাকে কখনো 'পারিবারিক গোলমাল', কোথাও 'মাতাল' আবার কখনো রাজনৈতিক চক্রান্ত বলে লেবেল লাগিয়ে দিচ্ছেন। অথচ এই মা-মাটি-মানুষের সরকার মানুষের করের টাকাতেই উঞ্ছবৃত্তি করছে, উৎসবের বন্যায় ডুবে যাচ্ছে। তেলা মাথায় তেল দিয়ে খেলোয়াড়, বিশিষ্ট মানুষদের এবং ক্লাবগুলিকে খোলা হাতে টাকা দিয়ে চলেছে। এই মাটির সাধারণ শ্রমজীবী মা-মানুষের চিন্তা তাঁর নেই।

সরকার ঘোষণা করেছিল যে কুইন্টাল প্রতি ৬০০ টাকা দরে চাষীদের কাছ থেকে আলু কিনে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, মিড-ডে মিলে সরবরাহ করবে, কিন্তু ঘোষণাই সার। আরো দেখা যায় রাজ্যের সমস্ত হিমঘরগুলিতে আলুচাষীদের বণ্ড দেওয়া হচ্ছে না এবং বণ্ড বিলি ঘিরে চলছে প্রচণ্ড কালোবাজারি, যার সঙ্গে যুক্ত সরকার পক্ষের লোকজন। হিমঘরগুলির ক্ষমতার তুলনায় উৎপাদন বেশী হচ্ছে। সরকারের কোন চিন্তা ভাবনা নেই হিমঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি করার।

স্বাভাবিকভাবেই আলুর দাম নিয়ে এবং আলুচাষীদের আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে চাষীদের বিক্ষোভ-আন্দোলন বাড়ছে এবং আরো বাড়বে। আমরাও শ্রমজীবী মানুষের অংশ হিসাবে এই লড়াই-আন্দোলনের পাশে আছি। □

কুমকুম মিত্র

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ১২ই জুলাই কমিটির মিছিল

রাজ্য জুড়ে নারী নির্যাতন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে গত চার বছরে। পার্ক স্ট্রীট কাণ্ডে ধর্ষিতা সুজেট জর্ডন সম্প্রতি সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। ধর্ষকদের দমন করার পরিবর্তে ধর্ষিতাকে কলঙ্কিত করায় রাজ্য সরকারের তৎপরতা দেখা গেছিল। প্রতিবাদী ঐ নারী বলেছিলেন, আমি কেন মুখ ঢাকবো, মুখ ঢাকুক অপরাধীরা। তারপর দুষ্কৃতীদের হাতে নারীর অসম্মানিত-নির্যাতিত হবার ঘটনার সারি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। কাটোয়া, বীরভূম, মধ্যমগ্রাম, কামদুনি, ফালাকাটা, রানাঘাট একের পর এক এত ঘটনা, যে সবটার কথা একসঙ্গে মনে করে বলাও কঠিন। শুধু এটা বুঝে নিতে কারও অসুবিধে হবার কথা নয় যে এই সরকারের আমলে অপরাধের বাড়বাড়ন্তের কারণ আইন রক্ষক পুলিশ-প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদত। নারীর প্রতি আক্রমণ আজ শাসকদলের রাজনৈতিক হাতিয়ার। এই পরিপ্রেক্ষিতেই গত ৩০ মার্চ ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক- শিক্ষাকর্মীরা মিছিল করেছেন ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেল থেকে কলেজ স্ট্রীটে বিদ্যাসাগরের মূর্তির পদতলে। নারীদের প্রতি আক্রমণের প্রতিটি ঘটনার বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে মিছিল। □

আজকের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতিপালনের তাৎপর্য

পরমেশ দে

শোষণ-বৈষম্য-অনাচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ জানিয়ে প্রতি বছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতিপালিত হয়। সারা বিশ্বে সমাজের সর্বস্তরের নারীরা আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন করে শপথ গ্রহণ করে থাকেন এদিন।

১৯০৮ সালের ৮ মার্চ আমেরিকার নিউ ইয়র্কে দর্জি নারী শ্রমিকদের ভোটাধিকারের ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামকে স্মরণ করে অবিসংবাদী কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিনের উদ্যোগে ১৯১৪ সাল থেকে প্রতিবছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে স্বীকৃতি দান করে।

নারী আন্দোলন-গণআন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই আন্দোলনের একটি পৃথক তাৎপর্য আছে। আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থায় যেহেতু সামন্তবাদী ব্যবস্থার রেশ আছে— সে কারণে বুর্জোয়া ব্যবস্থার শোষণ-নিপীড়নের সঙ্গে নারীদের প্রতি শোষণ-বঞ্চনা-উৎপীড়ন অন্য একটি বিশেষ মাত্রা গ্রহণ করে থাকে। উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রে বঞ্চনার প্রথম শিকার নারী। এর উপর লিঙ্গ বৈষম্য, গার্হস্থ্য হিংসা এমনকি যুদ্ধাক্রান্ত বা জঙ্গী-সন্ত্রাস কবলিত অঞ্চলেও প্রথম 'টার্গেট' নারী। শারীরিক, মানসিক নির্যাতনের প্রশ্নে 'সফ্‌ট-টার্গেট' নারী। এখানে যে কোনো অস্থির পরিস্থিতিতে, সাম্প্রদায়িক হানাহানি এমনকি খাদ্য নিরাপত্তার অভাব ঘটলেও সবচাইতে আগে আক্রান্ত হন নারীরাই। সেকারণে নারীদের সমস্যা বহুমাত্রিক।

ভারতে জনসংখ্যার এ বছরের রিপোর্টে পুরুষ নারী লিঙ্গ অনুপাতে ১০০০ পুরুষ প্রতি নারীর সংখ্যা ৯৪৩। কিন্তু তার মধ্যেও দেশের অসংগঠিত বিশেষত গৃহভিত্তিক শিল্পে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৯৬ শতাংশ। তারা কম মজুরীতে কাজ করে, কর্মক্ষেত্রে কোন নিরাপত্তা নেই। সামাজিক সুরক্ষাবিহীন ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদেরই বেছে নেওয়া হয়। আবার অন্য কনর্মক্ষেত্রগুলিতে যখন ছাঁটাইয়ের প্রশ্ন আসে তখন সর্বাগ্রে নারী শ্রমিকদেরই বেছে নেওয়া হয়। কর্মক্ষেত্রে নারীরা যৌন লাঞ্ছনারও শিকার হন প্রায়শই। ১৯৯৭ সালে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও এখনও কর্মক্ষেত্রে নারীদের যৌন লাঞ্ছনার প্রশ্নে কোন আইন পাশ করা হয়নি। এরাজ্যে তো প্রতিদিন সংবাদপত্রের একটা বড় অংশ জুড়ে প্রকাশিত হয় ধর্ষণের ঘটনা। ভারতবর্ষে নারী নির্যাতনের পরিসংখ্যানে এখন এরাজ্য সর্বাগ্রগণ্য। রাজ্যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী অথচ এখানে মহিলাদের নিরাপত্তার অভাব বেশি। দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের তৎপরতা এরাজ্যের প্রশাসনে পরিলক্ষিত হয় না। এখানে ধর্ষণ সহ নানা অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে যেহেতু শাসকদলের মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীদের দ্বারা তাই সরকার, পুলিশ প্রশাসন এখানে নির্বিকার। উল্টে মন্ত্রী নেতারা তাঁদের অমৃতবাণীতে ধর্ষণের দায় সংশ্লিষ্ট মহিলার উপরই চাপান। এখানে কামদুনী-মধ্যমগ্রাম-ধূপগুড়ি বা রাণাঘাট সর্বক্ষেত্রেই সরকারী ভূমিকা ন্যক্কারজনক। আবার খাপ-পঞ্চায়েতি কায়দায় শাসকদল এখানে অনেক ক্ষেত্রেই বিচারের বিধান দিয়ে থাকে যা নারী লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে বিচার তো দূরে থাক — তাকে আরো জঘন্য মাত্রা দেয়।

আমাদের দেশের সামগ্রিক ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থা সম্পর্কে আরো কিছু পরিসংখ্যান এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন দেশে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে পুরুষের সংখ্যা যেখানে ৮২.১৪ শতাংশ, সেখানে নারীর সংখ্যা ৬৫.৪৬ শতাংশ। স্কুল ছুটের ক্ষেত্রে নারীদের সংখ্যা বেশি। এদেশে প্রতিমিনিটে একজন নারীকে হত্যা করা হয় পণজনিত কারণে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো প্রকাশিত ২০১৩ সালের রিপোর্টে দেখা যায় সে বছরে ২৪,৯২৩ জন নারী নির্যাতিতা হন — আর তার মধ্যে ২৪,৪৭০ জন পরিবারের আত্মীয় পরিজন বা প্রতিবেশী দ্বারা নিগৃহীতা।

এদেশ ৫৫ শতাংশ মহিলা রক্তাল্পতায় ভোগেন ৩৬ শতাংশ অপুষ্টির শিকার। প্রসবকালীন শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৪৮.৯ শতাংশ। শৌচালয়জনিত অসুবিধায় সবচাইতে বেশি ভুগতে হয় মহিলাদেরই। এসব সত্ত্বেও বি জে পি সাংসদ, সাক্ষ্মী মহারাজ হিন্দু নারীদের চারটি সন্তান জন্ম দেওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। আর বি জে পি সরকার এবারের বাজেটে নির্মমভাবে ছাঁটাই করেছে কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, সমাজকল্যাণ, নারী ও শিশু কল্যাণের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ কি নির্মম পরিহাস! অবশ্য এতে আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ বি জে পি সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হওয়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে কাজ করেছে কর্পোরেট লবি স্পনসরিং প্রচার। স্বাভাবিকভাবে ক্ষমতায় এসেই সেই ঋণ পূরণে তৎপর হয়েছেন নরেন্দ্র মোদী, বাজেটে তারই প্রতিফলন। জনস্বার্থে বরাদ্দ ছাঁটাই-কর্পোরেট পছন্দে বরাদ্দ নির্দ্ধারণ। যোজনা কমিশন আগেই বাতিল হয়েছে। রেগা, রেশন তুলে দেবার ব্যবস্থা মোটামুটি পাকা। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ছাঁটাই, পেট্রোল-ডিজেলের দামের বিনিয়ন্ত্রণ, ওষুধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রির মূল্যবৃদ্ধি-ভুরতুকি ছাঁটাই। সবই নয়াউদারবাদী নীতির আগ্রাসী রূপায়ণের ফলশ্রুতি। আর এই নীতিতেই প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি— ঢালাও বেসরকারীকরণ। প্রতিরক্ষা উৎপাদন, রেল, বীমা-র মতো জরুরী ক্ষেত্রগুলিও এর আওতায় ঢুকেছে। এই হচ্ছে বি জে পি প্রতিশ্রুত 'সুদিন' আসার হাল। বলা হয়েছিল 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'। অর্থাৎ আদানি, আম্বানিরা আর আমি-আপনি সবারই নাকি একসাথে বিকাশ ঘটছে— মিডিয়া মোগলরা কি বলেন? তাই তো!

উদারনীতির স্বার্থে সরকারের আর এক পদক্ষেপ — শ্রমিক মারা আইন। নিঃসন্দেহে বলা যায় যা থেকে শ্রমজীবী মানুষের অংশ হিসাবে বঞ্চিত-নিপীড়িত হবেন শ্রমজীবী নারীরাও। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' শ্লোগানের আড়ালে আক্রমণ নামানো হয়েছে শ্রমিকের ঘাড়ে - সংশোধিত করা হচ্ছে শ্রম আইন। 'শ্রমের ভারতে'র ধুয়ো তুলে বহু সংগ্রামে অর্জিত স্বীকৃত আইনী রক্ষাকবচগুলি লোপাট করা হচ্ছে শ্রমিক কর্মচারীদের। প্রচলিত শ্রম আইন নাকি 'উন্নয়নের' পক্ষে বাধাস্বরূপ — এর পরিবর্তন দরকার। এ কথাই ধ্বনিত হয়েছিল ২০০২-এ 'রবীন্দ্র ভার্মা কমিশনের' রিপোর্টে। সে জন্যই 'অ্যাপ্রেন্টিসেস অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ২০১৪'। 'দ্য ফ্যাক্টরীজ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ২০১৪' — কাজের ঘন্টা ৮ ঘন্টার বদলে ১২ ঘন্টা করা, রাতের শিফটে (সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৬টা) শ্রমজীবী মহিলাদের কাজ করাকে বাধ্যতামূলক করা। তাছাড়া, ২০ জনের বদলে ৪০ জন পর্যন্ত শ্রমিক কাজ করেন এমন কারখানায় শ্রমিকদের কোন তথ্য-নথি রাখার বাধ্যবাধকতার থেকে মালিকদের ছাড়। ফলে ৯০ শতাংশ কারখানাতেই আর রেজিস্টার রাখতে হবে না কর্তৃপক্ষকে। এছাড়া ১৯৪৮ সালের ন্যূনতম মজুরি আইনেও পরিবর্তন আনতে চাওয়া হয়েছে। যাতে মজুরী ও মহার্ঘভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে মালিকদের স্বেচ্ছাচারের অধিকার থাকছে। একেই সমান কাজে সমান মজুরী আইন পাস হওয়া সত্ত্বেও মজুরী বৈষম্য বজায় আছে। কৃষিক্ষেত্রে ক্ষেতমজুর পুরুষের গড় মজুরী যেখানে ১৭৮ টাকা সেখানে মহিলা ক্ষেতমজুর পান ১০০ থেকে ১২০ টাকা। সেক্ষেত্রে এই আইনটি আরো ... করবে মহিলা শ্রমিকদের।

বিধানসভা এবং সংসদে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ আইন আজও পাকা হয়নি যা থেকে আইন সভায় মহিলাদের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে সোচ্চার হওয়ার ক্ষেত্রটিও সঙ্কুচিত। এর উপর 'গোদের ওপর বিষফোঁড়া'-র মতো জাত পাত-বর্ণ-সামাজিক কুসংস্কারকে ভিত্তি করে সম্প্রদায়িক উন্মাদনা তৈরী করে সংগঠিত সংগ্রাম আন্দোলন ভেদ-বিভেদ আমদানিতে সক্রিয় আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল এবং ক্ষমতাসীন বি জে পি। শিক্ষা ও সামাজিক-সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাম্প্রদায়ীকিকরণ কর্মসূচী রূপায়িত করা হচ্ছে, প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে মন্ত্রীসভায় আর এস এসের একান্ত আস্থাভাজনদের বসানো হচ্ছে। চলছে ধর্মান্তরকরণ - পুনঃধর্মান্তরকরণ, সংঘ পরিবারের নিদান - 'লাভ জেহাদ'। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত পুরুষের সঙ্গে হিন্দু নারীর কোন বৈবাহিক সম্পর্ক হতে পারবে না। মুসলমান খ্রীষ্টানদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আক্রান্ত হচ্ছে। এতে সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাবাদও মাথা চাড়া দিচ্ছে, মোদী ক্ষমতায় আসার পরবর্তী দু'মাসে দেশে ৬০০ টি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। পরবর্তী আটমাসে এই সংখ্যা দ্বিগুণ ছাড়িয়ে গেছে। আগেই বলেছি সমাজে যে কোন অস্থিরতার প্রথম শিকার নারীরাই। এই বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে অর্থনৈতিক ভাবে শোষণ-বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে যেমন সংগ্রাম তীব্রতর করতে হবে তেমনি সামাজিক বঞ্চনা-উৎপীড়ন, জাত-পাত-ধর্মান্ধতা, সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের শপথ গ্রহণ করতে হবে নতুন করে। সেই সাথে লড়াই জারী রাখতে হবে মহিলাদের সম্পর্কে সমাজের মনোভাব তথা পুরোনো ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন আনতে সমাজকে বাধ্য করতে। □

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।